

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্রীঅবনীমোহন রায়

তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১২ বিনোদ সাহা লেন

কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ১২·০০

বন্দি

[মফঃস্বল শহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ড্রয়িং রুম। ডানদিক দিয়ে বাইরে যাবার আর বাঁদিক দিয়ে ভেতরে যাবার রাস্তা। পেছনের দেওয়ালে দরজা আছে। সেটা আর একটা ঘরের ইঙ্গিত দেয়। ঘরের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী কমলা অথবা উর্মিলা অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। বাইরে থেকে বেয়ারার সাড়া পাওয়া গেল।]

স্ত্রী : ভেতরে এস। কি ? কি বললেন ?

বেয়ারা : আসছেন। বল্লেন খাবার যদি বিলকুল রেডি থাকে তাহলে একটু খেতে পারেন।

স্ত্রী : যাও তুমি, বল গিয়ে খাবার তৈরীই আছে [টেবিলের উপর রাখা একটা ঘণ্টা বাজায়—একজন বর্ষীয়সী ঝি ঢোকে] কালোর মা, ঠাকুরকে বল মাংস গরম করতে, আর ঘি গরম রাখুক, সাহেব এলেই যেন লুচি ভাজতে শুরু করে।

ঝি : যাই। তা খবর কিছু পেলে ?

স্ত্রী : কৈ আর ! তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। ভেবে পাইনা, হাজত থেকে পালায় কি করে লোকটা। যত সব ইডিয়ট।

ঝি : ইস্মাইল বেয়ারা বল্তেছিল ও নাকি চাষা খ্যাপানে ভদ্দর নোক। আগে যেমন সব সেই স্বদেশী ডাকাত হোত না, সেইরকম। কোন্- জমিদারের নায়েবকে নাকি খুনও করেছে !

স্ত্রী : তাই নাকি ? তা ওরা সব পারে। নিজের চেয়ে বড় ওদের কাছে কিছু নেই। স্বার্থপর !

ঝি : না না ! যে দুধওয়ালাটা বিক্যালে দুধ দেয় না, সে বলতেছিল

নোক নাকি ভাল। গরীবির দিকি খুব টান। সেই আগে যেমন ছ্যাল না? বল্‌তেছিল—

স্ত্রী: থামো! দুধওয়ালা ত সব জানে। আমার আর জানতে কিছু বাকী নেই। [বাইরে একটু দূরে কথার আওয়াজ পাওয়া যায়। স্ত্রী দরজার কাছে গিয়ে দেখে] উনি বাগানের গেটের কাছে এসে পড়েছেন। শীগ্‌গীর যাও। ঠাকুরকে বল এখুনি সব রেডী করতে। আর শোন, দেরি দেখলে ঠাকুরের সঙ্গে একটু হাত দিও—

ঝি: সে আর তোমাকে বলতে হবে না। [বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঢোকেন এই মহিলার স্বামী। ঢুকতে ঢুকতে মাথা থেকে হ্যাট্‌টা খোলেন, স্ত্রী হাত থেকে হ্যাট্‌টা নেয়।]

স্ত্রী: বোস। দেরি হবে না, এখুনি খাবার আনছে। কি, কোন হদিস পাওয়া গেল?

স্বামী: এতই সোজা! ওরা সব ঘাগী লোক। একবার যখন বেরুতে পেরেছে, ওকি সহজে ধরা দেবে?

স্ত্রী: হ্যাঁ। শুনলাম, লোকটা নাকি পলিটিক্যাল?

স্বামী: হ্যাঁ। ও, ঐ ছোট দারোগাটাকে যদি না আমি—

স্ত্রী: ও তাই বল, ওনারই কীর্তি।

স্বামী: ইডিয়ট, ঐ রকম একটা আসামীকে ঐ রকম একটা ঘরে রাখে।

স্ত্রী: ঠিক্ হয়েছে। ওকে কত প্রশ্রয় তুমি দিয়েছ। ঠিক শোধ দিয়েছে তার।

স্বামী: আমি কিন্তু পনের মিনিটের বেশী সময় দিতে পারব না। খাবার যদি দেবার হয়ত দাও, নয়ত—

স্ত্রী: কি আশ্চর্য, এই এলো বলে। কালোর মা, তাড়াতাড়ি আনো না। [স্বামীর কাছে একটু হেসে] রাগ করলে? কিন্তু সত্যি বল, তুমি ভালোমানুষ বলেই না ওরা ঐরকম করতে সাহস করে।

স্বামী: কিন্তু আমাকে ঠিক চিনতে পারেনি। ভালো মানুষ! এবারে ওকে আমি—

স্ত্রী: আমার ত মনে হয়, একটা Strong step নেওয়া উচিত। তা পালিয়েছে কখন?

স্বামী: ওকে কি বলে পালিয়েছে?

স্ত্রী: না তা নয়, ও যদি সত্যি ও রকম সাংঘাতিক লোক হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ত তোমাকে জানান উচিত ছিল।

স্বামী: ছিলই তো! সেইটেই তো হয়েছে ওর মারাত্মক অপরাধ! ওই রকম একটা ধড়িবাজ পলিটিক্যাল লিডার—ওকে যদি ধরতে না পারি তাহ'লে আমার অবস্থাটা কি হবে ভাবতে পারো? একে তো সেই মাদ্রাজী D. M. নলখাড়ীর ব্যাপারটা নিয়ে বারে বারে নোট পাঠাচ্ছে। শেষের নোটটায় লিখেছে যে চেষ্টা থাকলে যে রিং লিডারগুলোকে ধরা যায় না তা নাকি তিনি বিশ্বাসই করেন না। এখন যদি শুনতে পায়—আর—পাবেই —যে হাজত থেকে পালিয়েছে তাহলে? ওঃ ওই সাহাটাকে —তুই তো জানতিস ওর রেকর্ড, বর্ন ক্রিমিন্যাল-এর মতন বর্ন পলিটিক্যাল! এখন আমাকে ন্যাকার মত সব বলছে। এখন বলে কি হবে? তুই যদি এতই জানতিস তাহলে সাধারণ হাজতে রাখতে গেলি কেন? আর রাখলিই যদি কন্‌স্টেবলটাকে ভালো করে সাবধান করে দিলি না কেন?

স্ত্রী: তোমার কিন্তু ওকে আর একটুও দয়া করা উচিত নয়।

স্বামী: দয়া! দয়ার কথা উঠছে কিসে?

স্ত্রী: এখন বলছ বটে, কিন্তু লোকটা সামনে এলে—একটু কাঁদলে ঠিক গলে যাবে।

স্বামী: আচ্ছা তুমি দেখে নিও, আমাকে যতটা দুর্বল তুমি মনে কর ঠিক ততটা দুর্বল আমি নই।

স্ত্রী : দুর্বল তো নও ; তুমি যে ভালো মানুষ—

স্বামী : ঠাট্টা করছ ! কিন্তু আমি যেভাবে এদের case-টা Frameup করেছি না ! ঘর জ্বালান, নরহত্যা, লুঠ, দাঙ্গা সবগুলো চার্জ একসঙ্গে এবং এমন সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে যাতে at least এই পালের গোদাটাকে ফাঁসীতে লট্‌কান যায়।

স্ত্রী : ওকি সত্যিই খুন করেছে না কি ?

স্বামী : না, তা বোধহয় নয়। এক কালে টেররিস্ট ছিল তো ! তখন এত সব করেছে যে এখন বোধহয় বোষ্টুমী ভাব এসেছে। —কিন্তু আমি ওর নামে ঐসব চার্জ আনতে বলেছি, না হলে ওকে ফাঁসানো যাবে না। ওর আগেকার কীর্তিকলাপ বরং আমার কাজেই লাগবে। কেসটা এমন ভাবে এর কেসটা ফ্রেক আপ করেছিনা যে, কোন জুরি ইচ্ছে থাকলেও ছাড়তে পারবে না। [খাবার আসে। ঝির হাত থেকে স্ত্রী খাবার নেয়।] তখন ঐ মাদ্রাজীও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্‌, আমিও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। কি করবি কর।

স্ত্রী : সেই আজ কত বছর ধরে সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। লোককে বলতেও যেন কেমন লাগে।

স্বামী : হ্যাঁ, ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করে আনো তো ! আজ দুবছর ধরে ও ফেরারী। ওঃ একবার যদি পাই। তবে বেশীদূর পালাতে পারেনি। আউট অফ রিচ হ'তে গেলে ওকে নদী পেরিয়ে জঙ্গলে যেতে হবে। দিনেরবেলা নদী পর্যন্ত আসতে পারেনি নিশ্চয়ই। আর সেই রিস্কই যদি ও নেয় তবে জ্যান্ত ধরতে না পারলেও মরাই ধরব।

স্ত্রী : [হঠাৎ নিস্পৃহ হয়ে] মাংসটা ঠিক হয়েছে তো ? নতুন ঠাকুরটা আবার পারে না ঠিক ক'রে—আমিই গিয়েছিলাম, কিন্তু এই গোলমালে শেষটা আর দেখতে পারলাম না।

স্বামী : একটু বেশী গলিয়ে ফেলেছ, আমার আবার শক্ত না থাকলে বিচ্ছিরি লাগে। বিলিতী রান্নায় ওরা তো রক্তটা ধোয় না— রক্তশুদ্ধই রাঁধে, তাতে অনেক বেশী তার হয়। একটু কাঁচা কাঁচা থাকে।

স্ত্রী : [কণ্ঠে কোথায় যেন একটু তীব্রতা আসে] মোটেই না। মাংসকে মাংস বলে চেনা গেলে বরং সেটা খেতেই ঘেন্না করে। তাই আমরা হলুদ দিই, চিনি ভেজে দিই, যাতে রংটা অন্যরকম হয়।

স্বামী : আর সেইজন্যেই তো আমাদের রান্নায় কোন উপকার থাকে না। আরে বাবা, যেটা উপকারী সেটা তো সোজাসুজি তেমন করেই করতে হবে যাতে উপকারটা পাও।

স্ত্রী : [একটু চুপ করে থেকে রিভলবারটা হাতে নেয়।] ঐ সাহাটা যদি ঐ রকম না করত তাহলে তো তোমাকে বাপু ঐসব নোংরা কাজে নামতে হোত না। লোকটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ, আমি তোমাকে বলছি একেবারে ঘরমুখো।

স্বামী : আসলে অলস, কোন উচ্চাশা, মানে ambition কিছু নেই। আমি বুঝতে পারি না। আরে তুই যদি উন্নতি না করিস তো যার জন্যে তুই কাজে ফাঁকি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাস সেই স্ত্রীই'তো তোকে সম্মান করবে না।

স্ত্রী : হ্যাঁ, সেই রকম স্ত্রী কিনা। স্বামীকে একেবারে আঁচলের তলায় রাখতে যায়। এই যে মুনসেফের বাড়িতে সেদিন সকলে ঐ সাহাকে স্ত্রৈণ বলে ঠাট্টা করছিল। জানতে তো পারে তাতে কি কোন লজ্জা হয়? আর লোকটাকেও বলি, বিয়ের চোদ্দ বছর পরেও একি! ঐতো রক্ষেকালীর মত চেহারা। একটা হাত আবার নুলো। ওকি! খাওয়া হয়ে গেল! আর একটা লুচি খাও অন্ততঃ—

স্বামী : নাঃ, বেশী খেলে দৌড়তে পারবো না।

স্ত্রী : তুমি কেন দৌড়বে ? এই পঙ্গ-পাল সরকার মাইনে দিয়ে তাহলে পুষছে কেন ? যদি তোমাকে ডাকাত ধরতে দৌড়তে হয় ?

স্বামী : প্রমোশনটা যে আমারই হবে, তাই। যাক্, যা হয় করিয়ে নিক। ঐ যে বলে এণ্ড জাসটিফাইস দি মিনস আর তাছাড়া আমি নিজে যদি ওকে পিস্তল হাতে অ্যারেস্ট করতে পারি তার আলাদা একটা এফেক্টও আছে। তাহলে আর কারুর সাধ্যি হবে না যে আমার প্রমোশন নিয়ে টাল-বাহানা করে। আর তারপর—তাহলে উর্মিলাদেবীর হাতপাখা টেনে হাত ব্যথা করতে হবে না। কেরোসিনের আলোতে নভেল পড়তেও হবে না।

স্ত্রী : ভালো ইস্কুল নেই বলে বাসুকে কলকাতার বোর্ডিং-এ পাঠাতেও হবে না।

স্বামী : হ্যাঁ, আর আমাকেও বাসুকে বোর্ডিং এ পাঠাবার জন্য খোঁটা শুনতে হবে না। [দুজনেই হেসে ফেলে। স্বামী যদিও হাসতে হাসতেই বলে, তবু গলায় একটা সিরিয়াস ভাব এসে যায়] আর তাহ'লে উর্মিলাদেবী বোধহয় আমাকে আর একটু বেশী ভালো বাসতে পারবে, না ?

স্ত্রী : আহা ! এখন যেন কম বাসি।

স্বামী : [গলায় আর অফিসারী ভঙ্গীও নেই। হাসিও নেই, একটা বেদনা আছে।] বাসো। একটু কমই বাসো। অন্তত: বাসতে তো কম কিংবা হয়ত বাসতেই না !

স্ত্রী : [ঠাট্টার সুরটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে।] আহা, তোমাকে বাসি না তো কাকে ভালোবাসতে গেছি শুনি ?

স্বামী : কি করে জানব ? দেবা: ন জানন্তি, তবে এখন বোধহয় উর্মিলা দেবী আমাকে একটু একটু ভালোবাসে, না ?

স্ত্রী : তুমি আবার আগের কথা তুলে আমাকে খোঁটা দেবে ? এখন বুঝি একটু একটু ভালোবাসি ?

স্বামী : [হাসে] আচ্ছা বেশ, না হয় অনেকেই হ'লো ! না না, তোমায় দোষ দিচ্ছি না। মেয়েরা চায় স্বাচ্ছন্দ্য। তার ওপর তুমি বড়লোকের মেয়ে—যে যেখানে জন্মায়, সেতো তার চাইতে আরো ওপরে উঠতে চাইবেই। আমি যদি জীবনে উন্নতি করতে না পারি, তোমার মনের ভালোবাসা তো মার খাবেই ! সত্যি অনেক বোকামি করেছি আমি।

স্ত্রী : [সজল হয়ে ওঠে গলা] সেগুলো মোটেই বোকামি নয়। তুমি ভালো মানুষ তাই তোমার উন্নতি হয়নি।

স্বামী : ওগুলো বোকামি। মানুষ যেখানে এসে পড়ে তাকে তো সেখানকার মতই চলতে হবে। নিজেকে ভালোমানুষ বলে আমি অন্তত: নিজের সাথে চালাকী করতে চাই না কমলা ! [স্ত্রী : আশ্চর্য হয়ে তাকায়] হ্যাঁ, কমলা নামটা তো বেশ। কেন যে তুমি জোর করে বদলে তাকে ঊর্মিলা করলে !

স্ত্রী : [থতমত খেয়ে] তখন মনে হয়েছিলো ওটা বোধহয় খুব সেকেলে !

স্বামী : দূর ! সেকেলে ! কমলা নাম কখনো পুরোনো হয় ? অনেকবার মনে হয়েছে, তোমাকে কমলা বলে ডাকি। আজ ডেকেই ফেললাম। আচ্ছা কমলা, শহরে গেলে তোমার খুব ভালো লাগবে, না ?

স্ত্রী : লাগবে, সত্যি লাগবে। তখন আমাকে কাউকে কাছছাড়া করতে হবে না। এখন বাস্থর কাছে যেতে হলে তোমাকে ছাড়তে হয়। আর তোমার কাছে থাকতে হ'লে বাস্থকে ছাড়তে হয়। তখন আমাকে কাউকে ছাড়তে হবে না।

স্বামী : ভয় করবে না তো ?

স্ত্রী : [বুঝতে পেরেও] কেন ? [স্বামী মুখটা ফিরিয়ে নেয়] ও, না।

আমার হিষ্টিরিয়া যদি অতদিন না চলত তবে তুমিও ওপথে যেতে না। আমি জানি। শহরকে আর আমার ভয় নেই। আচ্ছা এখন তো আমি একদম ভালো হয়ে গেছি, না ?

স্বামী : হ্যাঁ, কিন্তু কেন তোমার হিষ্টিরিয়া হ'লো বলতে পার ?

স্ত্রী : আবার তুমি ঐকথা তুলবে ?

স্বামী : তুলিই না একটু! ধর যদি ফেরারীটার কাছে কোন অস্ত্র থাকে। মারা যেতেও তো পারি।

স্ত্রী : [চোখে জল এসে যায়] খবরদার বলছি, ওসব কথা বলবে না তুমি। তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে যেতে দেব না !

স্বামী : [হেসে] আমাকে তো ভালোবাসতে পারোনি তখন। কিন্তু কাকে ভালোবাসতে ? কাউকে বাসতে নিশ্চয়ই ?

স্ত্রী : না। তাকে ভালোবাসা বলে না ! তোমাকে তো বলেছি কতদিন ! তার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিলো কেবল। তারপর সে পলিটিক্সে ঢুকলো, বিয়েও ভেঙে গেল !

স্বামী : সেই কি তোমার বাবার বন্ধুর ছেলে যাকে তুমি পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে ?

স্ত্রী : না। [বাইরে থেকে চাপরাশির গলার আওয়াজ আসে।]

স্বামী : অন্দর যাও।

চাপরাশী : সাহ সাহাব, বাহার খাড়া হ্যায়।

স্বামী : [একটু ভেবে] অন্দর আনে বোলো। [জলের গ্লাস হাতে তুলে নেয়। স্ত্রী ভেতরে যাওয়ার জন্ত পা বাড়ায়] আরে ওটা আবার একটা পুরুষ মানুষ নাকি যে ওকে এত লজ্জা করতে হবে ?

[স্ত্রীর পা আটকে যায়। বাইরে গলা খাঁকারির শব্দ পাওয়া যায়। স্বামী অফিসারোচিত ভঙ্গীতে ঠিক হয়ে বসেন। স্ত্রীকে বসতে ইঙ্গিত করেন। স্ত্রী

পিছনের দিকে একটা চেয়ারে বসেন।] কাম ইন্ [ছোট দারোগা সাহা ঢোকেন। বয়স প্রায় চল্লিশ, ভীতু লোক, স্যালুট করেন।] yes?

সাহা: সব ব্যবস্থা পাকা স্যার। নদীর ওপারে সার দিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। ওপারে গেলেও পালাতে পারবে না স্যার!

স্বামী: আর?

সাহা: আর স্যার ঐ আপনি যেমন বলেছিলেন, পালাতে চাইলে জখম করতেও কেউ যেন দ্বিধা না করে। সবাইকে বলে দিয়েছি।

স্বামী: আমি কিন্তু আরো একটু পরিষ্কার করে আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। নিজে তো বুদ্ধি করে কিছু করতে পারবেন না। আফসার যে অর্ডার দেয় সেটাও ঠিকমত বলতে পারেন না লোককে।

সাহা: হ্যাঁ স্যার তাও বলেছি। বলেছি, এমন যদি আশঙ্কা হয় যে, মানে, আহত করেও ধরা গেল না, তাহলে নিহত করতেও কেউ যেন ভয় না পায়। ওপরের অর্ডার আছে। তবে—

স্বামী: তবে?

সাহা: তবে, এমনি যদি ধরতে পারা যায় সেইটাই ভালো।

স্বামী: খুব দয়ার শরীর আপনার না? একটু থেমে তবে এটা ব'লে ভালো করেছেন। দেখুন এ সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই কোরতে হোত না যদি না হঠাৎ দুপুরবেলায় আপনার স্ত্রীর সাথে প্রেম করবার ইচ্ছে চাগিয়ে উঠতো।

সাহা: [ভয়ে ভয়ে] স্যার! না, মানে—

স্বামী: দেখুন, একটা মিথ্যে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছেন আপনি। করবেন না কি পরিমাণ কাজে ফাঁকি দেন কেবল ঐ জন্যে

সকলেই জানে। সকলে এই নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে, আপনি জানেন না? জানেন নিশ্চয়ই, তবে সেটাকে সিরিয়াসলি নেননি। ভেবেছিলেন হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই দিন যাবে! কিন্তু এবারে আপনার পক্ষে ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস দাঁড়াবে, মনে রাখবেন। তা সে ও ফেরারীকে পাওয়া গেলেই কি, আর না গেলেই কি!

সাহা: স্যার? [অত্যন্ত নার্ভাস]

স্বামী: আপনাকে অনেক ইনডালজেন্স দেওয়া গেছে। আর নয়!

সাহা: স্যার, আপনি নিশ্চয়ই আমার চাকরি—

স্বামী: খাব কিনা? তাছাড়া আপনার যোগ্য শাস্তি আর কি হতে পারে আপনিই বলুন না! [হঠাৎ গলা ফাটিয়ে ব্যঙ্গ করবার ভাবে] তাছাড়া এই পুলিশের চাকরি আপনার মত ভালোমানুষের পোষাবে কেন? আপনাদের সব বড় বড় হৃদয়। প্রেমিক হৃদয়, পুলিশের তুচ্ছ কাজে তাকে নষ্ট করবেন? কি বলছিলে তুমি সেদিন ঊর্মিলা? কপোত-কপোতী কথা—[স্ত্রীর বোধ হয় এতটা সহ্য হয় না। তবু মুখে একটু হাসির ভাব এনে মাথা নিচু করে নেয়।]

সাহা: [গলা ধরে গেছে] স্যার চাকরি গেলে খাব কি স্যার? এই-বারটা মাপ করুন। জীবনে—

স্বামী: এই তিনবছর আপনি আমার আণ্ডারে এসেছেন, এর মধ্যে কতবার আপনাকে মাপ করা হয়েছে? এমন কি, এই ছমাস আগে যখন এই আন্দোলনেরই একটা ছোঁড়াকে ধরা হয়েছিল, কি নাম যেন তার?

সাহা: সুকোমল।

স্বামী: এখনও ভুলতে পারেন নি? নামটা তো দেখছি ঠিক মনে আছে! নিজের মনকে বোঝবার চেষ্টা করুন। দেখুন

আপনার সিমপ্যাথি কোনদিকে। যাই হোক, সেই স্বকোমলকে যখন হাজতে রাখা হয়েছিলো, তখন আপনার স্ত্রী মাংসভাত রান্না করে ওর জন্তে পাঠিয়ে দেননি। তখন আপনাকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়নি ?

সাহা : স্যার স্বকোমলের অত্যন্ত কম বয়স ছিল। আর ওকে যখন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে নিয়ে যায়, আমার স্ত্রী তখন ওকে দেখেছিলো।

স্বামী : নিষ্ঠুরের মত বলে তাই মিসেস্ সাহার মাতৃহৃদয় একেবারে উথলে উঠলো। তবু যদি উনি সত্যি সত্যি মা হতেন।

সাহা : আমি মানছি স্যার সেটা আমাদের খুবই অন্তায় হয়েছিলো। কিন্তু ও বল্লো ওর যা শাস্তি হবে, তাতো হবেই। মুখ দেখে মনে হলো তিন চার দিন খায়নি। একটু খেতে দিলে কি আর এমন হবে। আমিও ভাবলাম স্যার কোনরকম বন্ধুত্ব তো করতে যাচ্ছি না। শুধু একবেলা দুটি—

স্বামী : বেশ, তা এবারেও কি আপনার স্ত্রী জানলা দিয়ে কয়েদিকে দেখে—কিন্তু এবারে তো মাতৃভাব হবে না মিঃ সাহা—নিরবধি সামন্তর বয়েস তো আপনারই মত হবে ; না ? তা যাই হোক, এবারে কি পোলাও রান্না হবে বলে কিস্‌মিসের ফরমাস তামিল করতে গিস্‌লেন ?

সাহা : [ক্ষুব্ধ হয়] আমার যে দোষ হয়েছে তা আমি একশবার মানছি। এর জন্ত ও বেচারীকে বারে-বারে এর মধ্যে জড়াবেন না।

স্বামী : [গলা অত্যন্ত কঠিন] আপনি যদি নিজের বুদ্ধিতে চলতেন, তাহলে ওকে জড়াবার দরকার হোত না। আপনার স্ত্রী আমার আলোচনার যোগ্যও নন। এটা মনে রাখবেন।

সাহা : [অপ্রস্তুত হয়ে] না, মানে আমি ঠিক ওভাবে কথাটা বলিনি স্যার। মানে আজ তিনদিন ধরে ওর যা অবস্থা, তাতে

করে পরামর্শ দেবে কি স্যার, ভালো করে কথাই বলতে পারছে না।

স্বামী : থাক্, থাক্—

স্ত্রী : [কৌতূহলী হয়ে] আহা, শোনাই যাক্ না। আপনার স্ত্রীর কি হয়েছে ?

সাহা : [একটু হকচকিয়ে যায়, ঊর্মিলার দিকে ভালো করে তাকাতে পারে না।] খুব জ্বর, আপনারা তো সব জানেনই, ওর বাঁ হাতটা মানে ভাঙা—তার ওপর এই জ্বর—ওষুধটা ঢেলে খাবারও শক্তি নেই। একটা ঝি ছিল সে কাল থেকে ছুটি নিয়েছে। তার ছেলের বিয়ে। ঐসময় ছিল ওর ওষুধ খাবার সময়। তা আমি ভেবেছিলাম যাব আর আসব—

স্বামী : দেখুন, ওসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। হাতে পানি দাও রামসিং [ভিতরে চলে যায়।]

[স্ত্রী এবং সাহা দুজনেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। আড়ষ্টতা কাটাবার জন্যেই যেন স্ত্রী হঠাৎ উঠে পড়ে স্বগত বলার মতই বলে।]

স্ত্রী : যাই মসলাটা দিয়ে আসি। [স্ত্রী যখন প্রায় দরজার কাছে গেছে হঠাৎ সাহা ডাকে।]

সাহা : শুনুন; [স্ত্রী ফেরে] দেখুন আপনি যদি দয়া করে আমার কথাটা শোনেন। ওঁর এ ব্যাপারে মাথার ঠিক নেই। অবশ্য আমি একশবার মানছি যে, এজন্যে দায়ী আমিই। আমার স্ত্রীর যদি যাবার কোন জায়গা থাকত আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিতাম। সত্যি ওর যাবারও কোন জায়গা নেই—

স্ত্রী : বাপের বাড়িতে কেউ নেই ?

সাহা : আছে। মিসেস্ চৌধুরী, কিন্তু ওর যাবারও উপায় নেই। মানে

ওরা ব্রাহ্মণ আর আমরা তিলি। কাজেই বুঝতেই পারছেন। ওর যখন বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল, তখন ও পালিয়ে আমার কাছে চলে আসে। সেই দিনেই আমরা, মানে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করি। কিন্তু তার পরদিন ওর দাদা খোঁজ পেয়ে এসে উপস্থিত হন। এবং একটু কথা কাটাকাটির পরেই হাতের কাছে টেবিলে একটা এই মানে,—কাগজ চাপা দেবার পাথর ছিল, সেইটে তুলে "তোর মরাই ভাল" ব'লে ছুঁড়ে মারেন। হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়েছিল তাইতেই হাতটা জখম হয়ে যায়।

স্ত্রী : সেকি! চিকিৎসা করান নি?

সাহা : মানে, সে জায়গাটা তো ঠিক শহর ছিল না। তারপর ওকে নিয়ে কোলকাতায় গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। [একটু চুপ] ওর স্বাস্থ্য ইদানীং একেবারে ভেঙে পড়েছে। এ সময় যদি চাকরি যায় তাহলে মানে আমি একা হ'লে ভাবতাম না—আর এই বয়সে আমি যে আর কোন চাকরি যোগাড় করতে পারবো তাতো মনে হয় না। আপনি একটু যদি—

স্ত্রী : দেখুন, আপনাদের অফিসিয়াল ব্যাপারে আমি মোটেই থাকতে চাই না। [সাহা চুপ করে থাকে, একটু পরে বলে]

সাহা : খামোকা আপনাকে এতগুলো কথা বলে কষ্ট দিলাম।

[স্বামী ঢোকে]

স্বামী : কি ব্যাপার! আপনি এখনও যাননি!

সাহা : যাই স্যার। [চলে যায়]

স্বামী : কি এত বকরবকর করছিল!

স্ত্রী : ওর স্ত্রীর নাকি খুব অসুখ।

স্বামী : সত্যি নাকি?

স্ত্রী : মনে তো হ'লো! এখন মনে হচ্ছে অতটা না বললেও হতো!

স্বামী : মনে হচ্ছে ? যাক্ ! এইবার তাহলে বুঝতে পেরেছ যে সামনে এলে অতটা বলা যায় না। তবে তুমি সামনে না থাকলে উর্মি আমি হয়ত অতটা বলতাম না।

স্ত্রী : তার মানে ?

স্বামী : তুমি তো অফিসারেরও ওপরওয়ালা কিনা, ভয় হচ্ছিল পাছে আবার "ভালোমানুষ" হয়ে যাই। "ভালোমানুষ" কথাটা তো ভালোমানুষী করে বল, আসলে তো বলতে চাও, নির্বোধ প্রমোশন যে এবার আমার চাই-ই।

স্ত্রী : প্রমোশনে যদি তোমার দরকার না থাকে তবে আমার জন্ত তোমাকে কিছু করতে হবে না।

স্বামী : তোমার জন্তে তো নয়। আমার জন্তে। তুমি শহরে যাবে, খুশী খুশী থাকবে। তোমাকে খুশী দেখবার সাধ যে আমার অনেক দিনের।

স্ত্রী : আজ তোমার হ'লো কি ? আমি কি অখুশি আছি ?

স্বামী : কি জানি। বান্টু যখন হ'লো তখন তোমাকে খুব খুশী দেখেছিলাম। দেখি, বান্টুকে এনে দিলে হয়ত আবার খুশী হবে।

স্ত্রী : আজ কেন এতো পুরোনো কথা টেনে তুলছো বলতো ?

স্বামী : সত্যি। কেন ? [নিঃশ্বাস ফেলে] যাই। [বেল্ট শুদ্ধ পিস্তলটা কোমরে পরতে থাকে।]

স্ত্রী : আচ্ছা ঐ ফেরারীটাকে পেলেও কি সাহার চাকরি যাবে ?

স্বামী : না।

স্ত্রী : যাক—

স্বামী : সাস্‌পেনড হ'তে পারে।

স্ত্রী : আর পাওয়া না গেলে ? যাবে ?

স্বামী : হ্যাঁ।

স্ত্রী : তবে তুমি তো বাঁচিয়ে দিতে পার।

স্বামী : না ওকে বাঁচাতে গেলে নিজেকে মরতে হবে।

স্ত্রী : তার মানে ? আঃ বোলো না।

স্বামী : মানে—ইন্‌সপেক্টর রহমান আর বড় দারোগা ঘোষ দুজনেই গেছে রায়পুরের সেই জোড়া খুনের তদন্তে। তাই সাহা এখন ছিল আমার আণ্ডারে ডাইরেক্ট, ক'জেই—

স্ত্রী : ইস্। তাহ'লে কি হবে ? কি হতে পারে ? শুনিই না, কতটা খারাপ হতে পারে ?

স্বামী : একধাপ নীচে নেমে যেতে পারি, সাস্‌পেণ্ড হতে পারি। আর সেরকম লোকের হাতে গেলে, কি জানি কি হবে! তবে সব দোষ যদি আমি সুন্দর করে সাজিয়ে সাহার ঘাড়ে দিই, তবে এ যাত্রা কোন রকমে টিকে যেতেও পারি। কিন্তু প্রমোশন ? নৈব নৈব চ!

স্ত্রী : [সভয়ে] ভগবান, যদি ফেরারীটা ধরা পড়ে, তবে আমি জোড়া পাঁঠা বলি দেব।

স্বামী : [অবস্থাটা হাল্‌কা করবার জন্যে হেসে হাল্‌কা ভাবেই বলবার চেষ্টা করে] ইস্ একি করলে ? ও ব্যাটা তো এমনিও ধরা পড়তো, খামোকা দুটো প্রাণীহত্যার ব্যবস্থা পাকা করে ফেললে ?

স্ত্রী : সত্যি বলনা, বেশী দূরে যেতে পারেনি, না ?

স্বামী : তাই তো মনে হয়।

স্ত্রী : আমার ইচ্ছে করছে, তোমার সঙ্গে যাই, একটুও যদি সাহায্য করতে পারতাম তোমাকে। এখানকার লোকগুলো যা বোকা।

স্বামী : আমি তো জানি, ফেরারী আসামীদের ছেড়ে দেবারই অভ্যাস আছে তোমার। ধরবার অভ্যাস আছে বলে তো জানি না! আমার তো ভয়। আমি কষ্ট করে ধরবো—আর তুমি পালাবার রাস্তা বাত লাতে বসবে।

স্ত্রী : একবার ধরেই দেখ না। আমি যদি জজ হতুম না, তুমি ধরে আনলে আমি ফাঁসির হুকুম দিতুম।

স্বামী : কিন্তু ছেড়ে তো দিয়েছিলে একবার ?

স্ত্রী : আচ্ছা তখন আমার বয়স কত ছিল বলতো ? তখন বোকা ছিলুম বলে আর এখনও বোকা নেই।

স্বামী : তোমার দাদার কাছে শুনে ছিলাম সব গল্প। লোকটা পিস্তল দেখিয়ে ভয় দেখাতেই সুড় সুড় করে খিড়কীর দোর দিয়ে বার করে দেওয়া। এই তো সাহস !

স্ত্রী : আহা আমার অবস্থায় পড়লে দেখা যেত !

স্বামী : ছেলেটা তো তোমার বাবার বন্ধুর ছেলে ছিল, না ? তাই ভেবেছিল তোমাদের বাড়িতে ঢুকলেই বুঝি বেঁচে যাবে। তোমার বাবাকে ঠিক চিনতো না !

স্ত্রী : [অপ্রস্তুতের হাসি হেসে] হ্যাঁ বাবা হয়ত—

স্বামী : তোমার সঙ্গেও তো আলাপ ছিল, না ?

স্ত্রী : হ্যাঁ, আলাপ ছিল ! যতসব—

স্বামী : আহা, আলাপ ছিল বলা মানেই তো আর প্রেম ছিল বলা নয় ; কি মুশকিল ! তোমার দাদার কাছে সব শুনেছিলাম। প্রেম নিবেদন করেও যখন কোন ফল হল না তখন বীরপুরুষ পিস্তল বার করলেন।

স্ত্রী : এক খুনের গল্প করতে গিয়ে আর এক খুনে পালাবে ?

স্বামী : হ্যাঁ, যাই ; এ খুনে পালালে আমার চলবে না !

স্ত্রী : হ্যাঁ চলবে না, কিছুতেই না। শোন একটু সাবধানে থেকো। বলা তো যায় না, ফেরারীটার হাতে যদি কিছু থাকে।

স্বামী : ভালোই হবে। রণক্ষেত্রে জমবে ভালো ! জিতলে তো কথাই নেই। আর মরলে—নাঃ তাহলেও কথা নেই।

স্ত্রী : আজ তোমার হয়েছি কি ? [হাত ধরে বলে] না, তোমাকে আমি যেতে দেব না।

স্বামী : দেবে বৈকি ! তুমিও যেতে দেবে, আমিও যাব। না গেলে চলবে কেন ? তাহলে প্রমোশন হবে না। এক ধাপ নিচে নামতে হবে,—আর চাকরির খাতায় যদি এই কালো দাগ একবার লাগে, সে দাগ কি আর কখনো ঘষে তোলা যাবে ? তখন ছোট হাকিমের বৌ হয়ে, আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে, বড় হাকিমের বৌকে খোসামোদ ক'রে—যেমন কুমারেশবাবুর স্ত্রী তোমাকে করে থাকেন—ছোট হাকিমকে কতটা শ্রদ্ধা করতে পারবে উর্মি ?

স্ত্রী : পারবো, পারবো !

স্বামী : [হেসে মাথা নাড়ে] আর তোমার বাস্থ ? তোমার শহর ?

স্ত্রী : চাই না।

স্বামী : [আবার হাসে] আর যদি চাকরি যায় ? এই বয়সে আর কোথায় চাকরি খুঁজতে যাবে বল ? ব্যাংকের মাত্র ঐ সামান্য কিছু টাকা সম্বল ক'রে ছেলেকে নিয়ে বেকারের বৌ হতে কেমন লাগবে ?

স্ত্রী : যাই লাগুক—

স্বামী : [থামিয়ে দেয়] তাই আমাকেও যেতে হবে, আর তুমিও যেতে দেবে। উর্মি, এই যে রাতটা আসছে—এই রাতে একজনকে বলি যেতেই হবে। হয় সাহু, না হয় আমি। আর আমরা যদি দুজনে বাঁচতে চাই তবে ঐ নিরবধি সামন্তকে বলি যেতেই হবে······আচ্ছা যাই (বেরিয়ে যায়)।

স্ত্রী : [চুপ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যে হয়ে আসে। দূর থেকে মসজিদে আজান দেবার শব্দ ভেসে আসতে

থাকে। কালোর মা একটা কেরোসিনের টেবল্ ল্যাম্প নিয়ে ঘরে ঢোকে।]

কালোর মা : ওমা, অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? কাপড় ছাড়বে না ?

স্ত্রী : [যেন সম্বিত ফিরে আসে] অ্যাঁ, ও, হ্যাঁ।

কালোর মা : কি ? হ'ল কি ? কোন খারাপ খবর আলো নাকি ?

স্ত্রী : না, ইয়ে, কি যেন, হ্যাঁ, ছোটদারোগার বৌ-এর নাকি খুব অসুখ ?

কালোর মা : হ্যাঁ। খুব নাকি জ্বর। দুধঅলাটা দুধ দিতি গিয়েছেলো না ? তা বললে—যে এত নাকি জ্বর যে, দুধির পাত্তরটা সে এগোয়ে দেবে সে সামত্তও নেই। ও তাই নিজে পাত্তর খুঁজে নিয়ে, দুধ রেখে তবে আসে !

স্ত্রী : ও, তোমার কাজ হয়ে গেলে একবার দেখে এসোতো ছোট-দারোগার বৌকে ! আর যদি কিছু করবার থাকে তো ক'রে দিয়ে এস।

কালোর মা : [খুশী হয়ে] যাব ? আমিও তাই ভাবতিছিলাম, একবার যাওয়া ভাল। কেউ যায় ন ও বাড়ি। [বাসনগুলো তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলে] এখুনই যাচ্ছি। [ও চলে যায় স্ত্রী একলা বসে থাকে। পিছনের দরজা দিয়ে একটা লোক ঢোকে। পরনে ধুতি আর হাফশার্ট। শীর্ণকায়]

লোক : কমলা !

স্ত্রী : (চমকে তাকায়) কে !! [লোকটা হাসে] কে তুমি ?

লোক : আমি, আমি সত্যপ্রিয় চিনতে পারলে না তো ? অবশ্য না পারবারই কথা ! আমি কিন্তু তোমাকে প্রথম দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।

স্ত্রী : ও তু—মি ! কিন্তু তুমি এখানে কেমন করে এলে ? ও [একটু যেন বুঝতে পারে।]

সত্য : বলতে পার আসতে বাধ্য হলাম। যা ফেউ লাগিয়েছেন তোমার স্বামী চারিদিকে!

স্ত্রী : [এইবার যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে] ও, ও, ও তুমিই নিরবধি সামন্ত! তুমিই!! [চিৎকার করে কাউকে ডাকতে যায়। কিন্তু নিজেই আবার সামলে নেয়।]

সত্য : কি, আমাকে ধরিয়ে দেবে?

স্ত্রী : তুমি কি মনে করেছ তোমাকে ছেড়ে দেব! ষোল বছর বয়সে যে ভুল করেছিলাম—

সত্য : তিরিশ বছর বয়সে সেটা শুধরে নেবে?

স্ত্রী : হ্যাঁ। সুযোগ যখন এসেছে।

সত্য : তুমি কি তখন ভুল করেছিলে বলে তোমার মনে হয়?

স্ত্রী : নিশ্চয়ই! বাবার কথা শুনলে আজ আমাকে এত কষ্ট পেতে হোত না। কিন্তু এখানে এলে কি করে তুমি? আর এলেই বা কেন? তোমার ভয় করলো না?

সত্য : এলাম উপায় ছিল না বলে। হাজত থেকে কোনরকমে যখন বেরোতে পারলাম তখন হেঁটে চললাম নদীর দিকে। নদীপার হতে পারলেই—পৈতৃক প্রাণটার মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ে। কিন্তু নদীর কাছ বরাবর আসতেই দেখলাম, না: আর উপায় নেই, জেনে গেছে ওরা। তখন পাড়ের নীচ দিয়ে দিয়ে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত এলাম। চমৎকার জায়গায় তোমাদের বাড়িটা না? একেবারে নদীর ধারে। বেড়াতে যাও নিশ্চয়ই?

স্ত্রী : অবান্তর প্রশ্ন। তারপর?

সত্য : হ্যাঁ, তারপর। তারপর তোমাদের পিছনের আমগাছটা ধরে উঠে পড়লাম গাছে। অনেকক্ষণ ওখানেই বসেছিলাম। প্ল্যান করছিলাম, ইতিমধ্যে যদি ধরা না পড়ি তাহলে সন্ধ্যের অন্ধকারে

আবার নামবো নদীতে। চারিদিকেই লক্ষ্য করছিলাম। এমন সময় দেখলাম তোমাকে, কিরকম চেনা চেনা লাগল—তারপর যখন তুমি রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সবিস্তারে মাংস রান্নার কারকিত বোঝাতে লাগলে ঠাকুরকে, তখন গলার স্বর শুনে আর ঐ চিনি ভাজার কথাটা কানে যেতেই আর সন্দেহ রইল না। মনে আছে? সেই পালাবার আগের বার যেবার তোমাদের বাড়িতে যাই তুমি জিদ ধরলে তুমিই মাংস রাঁধবে—তোমার মা বলেছিলেন একটু চিনি ভেজে দিস্—তা তুমি প্রায় একপো চিনি ঢেলে দিয়েছিলে? উঃ কি মিষ্টি। কি মিষ্টি, কেউ আর মুখে দিতে পারে না। [হাসতে থাকে]।

স্ত্রী : [গলা কঠিন] আমার মনে পড়ছে না। তুমি কি পুরোনো কথা ঝালাতে এখানে এলে নাকি? কিন্তু তাতে কোন সুবিধে হবে না।

সত্য : না না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই। একটু বসব? [একটা চেয়ারে বসে] আমি যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেইদিক দিয়েই চলে যেতাম। কিন্তু একটু পরেই দেখলাম, তা আর হবার নয়। নদীর ওপর পর্যন্ত পুলিশ। পুলিশ নেই কেবল যে পর্যন্ত তোমাদের পাঁচিল বিরাজমান। ওরা কি করে ভাববে বল, যে খোদ বড় হাকিমের বাড়িতে ফেরারী আসামী ঢুকবে। অনেক ভাবলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, তোমার সঙ্গে দেখা না করে আর উপায় নেই—

স্ত্রী : তার মানে তুমি ভাবছ, আবার তোমার পালাবার ব্যবস্থা আমিই করে দেব ন?

সত্য : দেবে না?

স্ত্রী : আশ্চর্য! আশ্চর্য তোমার সাহস না, স্পর্ধা!—না, আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। কি ক'রে একটা লোক এরকম ভাবতে

পারে। পলিটিক্স করলে মানুষের চোখের চামড়া বোধহয় থাকে না। চৌদ্দ বছর আগে যাকে তুমি বিট্রে করেছিলে, আজ আবার তারই কাছে এসেছ? তারপর সে তোমার শত্রুর স্ত্রী: কি ক'রে ভাবলে যে আমার মনটা ঠিক চৌদ্দ বছর আগের মতই আছে? আশ্চর্য!

সত্য: মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাববার অবসর ছিল না। অন্যসব পথ যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন মনে হল হতেও তো পারে!

স্ত্রী: না। হ'তে পারে না।

সত্য: তুমি কি চৌদ্দ বছর আগের প্রতিশোধ এখন নেবে?

স্ত্রী: নিলেও দোষ হয় না, না নিজের কাছে, না অপরের চোখে।

সত্য: এই যে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে, এর মানে জানো?

স্ত্রী: জানি, একটা অসৎ লোকের, অসৎ কাজের শাস্তি।

সত্য: না। তুমি এখনও আমাকে ভালোবাস?

স্ত্রী: [তিক্ত কণ্ঠে] এইবার বুঝি মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাববার অবসর হ'ল? যাকৃগে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি ওঁর কাছে খবর পাঠাই— [যেতে উদ্যত হয়]

সত্য: শোন, একবার ভেবে দেখবে না?

স্ত্রী: ভাববার কি আছে?

সত্য: আমার কিন্তু ফাঁসি হতে পারে। তাছাড়া যে কাজটা আমরা করছি—তারও অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

স্ত্রী: ঠিক সেই আগেকার কথা! কিন্তু তুমি পালিয়ে গেলে আমাদেরও অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

সত্য: [ঠাট্টার সুরে] তা সত্যি, তোমার স্বামীর পদোন্নতি আটকে যাবে।

স্ত্রী: এতে ঠাট্টা করবার কিছু নেই। চাকরিতে পদোন্নতির কথা শুনলে তোমাদের ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হয় না? কিন্তু তোমাদের দলের

নেতা হবার জন্তে যখন তোমরা দল পাকাও, ক্লিক্ কর, তখন নিজেদের ঠাট্টা করতে ইচ্ছে করে না? আর এক্ষেত্রে পদোন্নতি মানে শুধু টাকা আর পজিশনই নয়। একটা বাচ্চা ছেলে তার মায়ের কাছে থাকতে পারবে।

সত্য: [যেন একটা নতুন খবর শুনলো] তোমার ছেলে? সে এখন কোথায়?

স্ত্রী: কোল্‌কাতার বোর্ডিং-এ। ওর পদোন্নতি হওয়া মানে, আমাদের শহরে থাকা, আর তার মানে,—একটা বাচ্চাকে তার মায়ের কাছে ছাড়া হয়ে কষ্ট পেতে হবে না!

সত্য: কত বড় হ'ল তোমার ছেলে?

স্ত্রী: [সে কথার উত্তর না দিয়ে] এক বছর আগে বাধ্য হয়ে বোর্ডিং-এ পাঠাতে হয়েছে।

সত্য: তুমি একেবারে হিউম্যানিটির কোশ্চেন এনে ফেল্‌'ল। তোমার ছেলের সম্ভবত খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ কি? যে চাষার বৌগুলো ছেলেকে কাছে রেখেও দুবেলা দু মুঠো খেতে দিতে পারে না, বাদের পরনে—

স্ত্রী: দোহাই তোমার, ঠিক সেই বাইশ বছর বয়সের মত কথা আর বোলো না। সেই নেতাদের শেখান কথা। এত বছর পার হয়ে গেল নিজের কিছু বলবার নেই?

সত্য: [অবাক হয়ে] সেই আগের মতই বলছি! কি বলছ তুমি?

স্ত্রী: কেন বুঝতে পারছ না? চাষা আর মজুরের জায়গায় পরাধীন ভারতবাসী বসিয়ে দাও, দেখবে ঠিক একই বক্তব্য।

সত্য: [চিন্তিত হয়] একই বক্তব্য? তোমার তাই মনে হচ্ছে? কিন্তু কথাগুলো কি মিথ্যে? সত্যিই কি আমাদের দেশের চাষা মজুর [স্ত্রী কেমনভাবে যেন তাকায়] বেশ চাষা মজুর কথাটায় যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে বলি—আমাদের দেশের

যারা গরীব। যারা নিঃস্ব তাদের জন্য কিছু করবার দরকার নেই?

স্ত্রী: আমি পলিটিক্যাল মেয়ে নই। তাই তোমার এ সমস্ত কথা আমি বুঝি না।

সত্য: আমাকে একটু জল খাওয়াবে?

স্ত্রী: জল? আচ্ছা, দাঁড়াও [কেউ জল চাইলে দিতে হয় এই বোধেই যেন জল আনতে যায়। কিন্তু যায় না। ফিরে বলে] আমাকে সরিয়ে দিচ্ছ কেন? পালাবে বলে?

সত্য: [হেসে ওঠে] বলেছি ত! নিজে নিজে পালাবার উপায় থাকলে তোমার কাছে আসতাম না। সেই কখন থেকে পিপাসা পেয়েছে! একটু জল খাওয়াবে না? [স্ত্রী একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সত্যর দিকে তারপর ভেতরে চলে যায়]

সত্য: আগেরই মত? আগেরই মত নেতাদের বুলি কপচে চলেছি? [স্ত্রী জল নিয়ে আসে, সত্য জল খায়।]

সত্য: বলেছ মন্দ না! আগেরই মত নেতাদের বুলি কপচে চলেছি।

স্ত্রী: সময় নষ্ট করবার মত সময় হাতে নেই। শোন, তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না। ছেড়ে দিলে আমার চলবে না। ওঁকে খবর পাঠাই। উনি নদী পার হয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছেন হয়ত।

সত্য: সেই ভাল। খবর পাঠাও। [স্ত্রী খানিকক্ষণ সত্যর দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর বলে]

স্ত্রী: একটা নিছক কৌতূহলের জবাব দেবে? [সত্য হেসে মাথা হেলায়] সেদিন কথা দিয়েও কেন এলে না? [সত্য চুপ করে থাকে] জেনে শুনে এতখানি মিথ্যে কথা আমাকে বলেছিলে কেন? ফিরে এসে আমাকে বিয়ে করবে এ প্রতিশ্রুতি না দিলেও তোমাকে আমি পালাবার সুযোগ করে দিতামই। এ তুমি জানতে তবু কেন?

সত্য : সেদিন তো মিথ্যে বলিনি !

স্ত্রী : তবে এলে না কেন ?

সত্য : আসতে পারলাম না ।

স্ত্রী : ও, পারলে না ।

সত্য : ঠাট্টা করছ ?

স্ত্রী : না । তুমি যে চমৎকার ঠাট্টাট করেছিলে আমার সঙ্গে সেই কথাটা ভাবছি । ভাবছি যে কত মেয়েকে কত কাপুরুষ এরকম কথা দিয়েছে । আর কথা ভাঙার পর বলেছে আসতে পারলাম না ।

সত্য : শোন আমার কথা । আমাদের দলে বিয়ে কেউ করত না । বলতে পার বিযে করার আইনই ছিল না । যারা বিয়ে করেছিলো বা করতো, আমরা তাদের ছোট চোখে দেখতাম । যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতো না ।

স্ত্রী : তোমার ভয় হ'ল, তোমাকে যদি ওরা ছোট চোখে দেখে ! সুন্দর আমাকে বলার সময় সে কথাটি মনে পড়েনি কেন ? পালাবার জন্য যে কোন ছলের আশ্রয় নিতে লজ্জা করেনি তোমার ? অবশ্য তোমাদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক ।

সত্য : রাগ করছ কেন ? আগে শোন !

স্ত্রী : রাগ করছি কেন ? লজ্জা করছে বলে ! আশ্চর্য সেই কথা ভেবে এখনও লজ্জা করে আমার । মা জানতেন, বাবার ভয় দেখানোকে তুমি গ্রাহ্য করবে না—কিন্তু আমাকে বোধহয় তুমি সত্যি ভালবাস, আমি সামনে গেলে আমাকে বোধহয় তুমি অস্বীকার করতে পারবে না ।

সত্য : পেরেছিলাম কি ? তোমার বাবা চলে যাবার পর—তখনও তোমার বাবার কথাগুলো কানে বাজছিল আমার : "সারেণ্ডার কর ! এমনি করে আমাদের সকলের আশায় ছাই দিও না । তোমার বাবার কাছে কথা দিয়েছিলাম আমি । তোমার মা

কমলার মাকে কথা দিয়েছেন। দশ বছর থেকে কমলা জানে তুমি তার স্বামী হবে। এখন এমনি করে সকলের সর্বনাশ কোরো না।" এমন সময় প্রদীপ নিয়ে তিনতলার ঘরে তুমি এলে। একটা ছবি যেন দেখলাম আমি। সত্যি অপরূপ সেই ছবি। ভাগ্যিস তখনও ইলেক্‌ট্রিক হয়নি রংপুরে।

স্ত্রী : হ্যাঁ। ছবিই দেখেছিলে মানুষ ত দেখোনি।

সত্য : মানুষ? তারপর তুমি যখন বললে—তুমি তোমার বাবার মত মনে কর না যে আমি কোন অন্যায় করছি, বরং তুমি আমার কাজে সাহায্য করতে চাও; তখন তোমাকে মানুষের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হল। মনে হ'ল—যাক্! তারপর তুমি চলে গেলে। আর আমার কাজ হ'ল অপেক্ষা করা, কখন আবার তুমি আসবে।

স্ত্রী : ভোর হ'ল।—কেউ জানল না যে তুমি তিনতলার ঘরে আছ। এমনকি দাদাও নয়।

সত্য : ঐ একটা ভালো কাজ করে ছিলেন তোমার বাবা। রাতে কি অন্ধকারই ছিল সেদিনকার রাত—চারিদিকের হৈ চৈ এর মধ্যে, বাগানের এক কোণে তোমার বাবাই টর্চের আলোতে প্রথম দেখতে পান আমাকে। দেখতে পেয়েই তোমাদের দারোয়ান, কি যেন নাম ছিল তার?

স্ত্রী : রামকানাই।

সত্য : হাঁা, রামকানাইয়ের দলকে পাঠিযে দিলেন একেবারে উল্টো-দিকে। আর আমাকে নিয়ে এসে বন্ধ করলেন তিনতলার ঘরে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। "তুমি কবে থেকে এই দলে গেলে? ছিঃ ছিঃ, এই কাজ কর তুমি" ওঃ আমার কি রাগ তখন—আমি তখন—যাক্‌গে আর কেউ জানতে পারলে কিন্তু

তুমি আমাকে অত সহজে বাগানের রাস্তা দিয়ে বের করে দিতে পারতে না কমলা!

স্ত্রী: বাবা, কিন্তু আরো গোটাকয়েক ভালো কাজ করেছিলেন।

সত্য: কি রকম?

স্ত্রী: যেমন পুলিশকে বলেছিলেন, আমাদের বাড়িতে কেউ আসেনি যেমন,—সেদিন দুপুরে, এবং রাত্তিরে—ওপরেই খাবেন বললেন। বললেন শরীর খারাপ নিচে নামতে পারছিনে। মা ঠাকুরের কাছ থেকে ভাতের থালা নিয়ে এলেন দোতলায়। আর সেই থালা নিয়ে আমি চলে গেলাম তিনতলার ঘরে—তোমাকে খাওয়াতে বাবার খাওয়া হ'ল না। মা-ও তাই উপোস করে রইলেন।

সত্য: এই কথাটা জানতে পারিনি তো সেদিন। এখন যদি উপায় থাকতো ক্ষমা চেয়ে আসতাম তোমার বাবার কাছে।

স্ত্রী: বাবা মারা গেছেন।

সত্য: ও। আর মা?

স্ত্রী: কানপুরে। দাদার কাছে। ইয়ে, তোমার—মা?

সত্য: বেঁচে আছেন। জ্যাঠামশাইয়ের গলগ্রহ হয়ে।

স্ত্রী: উপযুক্ত ছেলে তুমি।

সত্য: তোমার কৌতূহলের জবাব দেওয়া কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। তারপর সেই ভাতের থালা হাতে তুমি এলে।

স্ত্রী: তুমি বললে, সেইরাত্রে তোমাকে পালাতে হবেই। তানাহলে তোমার দলের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। আর তার মানেই ভারতবর্ষের পরাধীনতা ঘুচবে না।

সত্য: [ঠাট্টাটা গায়ে না মেখে] তুমি হয়ত সবটা বুঝলে না। কিন্তু কি যেন একটা বুঝেছিলে! শুধু বললে "আমার কি হবে!

বিয়ে করে তোমাদের বাড়িতে মায়ের কাছে রেখে যাও আমাকে কেবল এইটুকু কর আমার জন্যে।"

স্ত্রী : উঃ, সেটুকু বলতে সেদিন সে আমার—। পরে ঐ কথাটা ভেবে কত যে লজ্জা পেয়েছি।

সত্য : বিশ্বাস কর, সত্যিই সেদিন আমি মিথ্যে বলিনি। ভেবেছিলাম বিয়ে করেই কাজ করব। এমন কাজ করব যাতে কেউ না আমাকে ছোট মনে করতে পারে। ভেবেছিলাম নাই বা রইল আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক! তুমি আমার কথা ভাববে আর আমি তোমার কথা! কল্পনা করেছিলাম। আমি যখন বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিংবা পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটছি—পিপাসায় যখন আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—তখন হয়ত তুমি আমার মায়ের কাছে বসে আমার গল্প শুনছ। কোনদিন হয়ত ছোট্ট একটা চিঠি তোমাকে পাঠাতে পেরেছি। আর তুমি দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে—চুপি চুপি সেই চিঠি পড়তে বসেছ! কি ছেলেমানুষ যে তখন ছিলাম! কি রোমান্টিক।

[স্ত্রী যেন আচ্ছন্ন হয়ে কথাগুলো এতক্ষণ শুনছিল—শেষের কথাগুলো যেন শুনতে পায় না।]

স্ত্রী : আশ্চর্য!

সত্য : কি আশ্চর্য! রোম্যান্টিক হওয়াই।

স্ত্রী : [সেই রকম আচ্ছন্নের মত বলে] উঁ? না। আমিও ঐ একই রকম ভেবেছিলাম।

সত্য : একই রকম?

স্ত্রী : আমিও কল্পনা করেছিলাম তোমার ছোটবেলার ছবি দেখছি আর গল্প শুনছি,—আর—

সত্য : আর?

স্ত্রী : শুনেছিলাম তোমাদের বাড়িতে বিরাট একটা দীঘি আছে? সে

দীঘিতে রোজ সাঁতার দিতে? সেই দীঘিতে আমি চান করছি! উঃ কি ছেলেমানুষই যে তখন ছিলাম।

সত্য: কি বললে?

স্ত্রী: না বলছি, কি রোম্যান্টিক ছিলাম তখন!

সত্য: হ্যাঁ, ঐ কথা বলাই ভালো! বর্তমানের সিনিক সেলফ্‌টা তাতে কিছু আরাম পায়।

স্ত্রী: তারপর, তারপর কি হ'ল?

সত্য: তারপর তুমি তোমার মাকে গিয়ে বল্‌লে, না?

স্ত্রী: সেতো জানি—মা বাবাকে বললেন। বাবা তোমার কাছে গেলেন। তুমি কথা দিলে। অবশ্য আমাদের ষড়যন্ত্রের কথাটুকু জানলেন না। কি খুশী হয়েই নেমে এলেন বাবা। মাকে বল্‌লেন প্রশান্তর কথা রেখেছে, প্রশান্তর ছেলে। তুমি আজই বেয়ানকে চিঠি লিখে দাও চলে আসতে।

সত্য: হ্যাঁ, মাকে তোমার বাবা বেয়ানই বলতেন বটে!

স্ত্রী: কিন্তু তুমি কেন আর এলে না? কিংবা কোন খবর দিলে না?

সত্য: আসতে পারলাম না।—তোমার বাবার সরকার ঘেঁষা লোক বলে নাম ছিল।

স্ত্রী: সরকার ঘেঁষা লোক বলেই সেদিন পুলিশ অত সহজে বাবার কথা বিশ্বাস করেছিলো। তা না হ'লে বাড়ি সার্চ হোত। চৌকিদার একটা লোককে আমাদের বাগানে লাফিয়ে পড়তে স্পষ্ট দেখেছিল। এবং তুমি জান। সে সত্যিই দেখেছিল।

সত্য: তা ঠিক। যাই হোক কথাটা যখন সবে দলে বলেছি, ঠিক সেই সময়েই সরকারী খেতাব যারা পেয়েছিল তাদের নামের মধ্যে তোমার বাবার নামও বেরুল কাগজে। বিয়ে করবার অনুমতি যদি বা পাওয়া যেত কিন্তু রায়সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করবার অনুমতি আমি নিজেই চাইতে পারলাম না। কারণ জানতুম তা

অসম্ভব। আমি তোমাকে জানি কিন্তু তাদের আমি কি করে বোঝাতে পারতাম।

স্ত্রী : ও, এমনি করেই রায় সাহেবের মেয়ের বিচার হয়ে গেল!

সত্য : আমাদের বিচারও অত সহজে কোর না কমলা। তখন আমাদের সাবধান না হ'লে চলবে কেন? তখন দলের যা সমস্যা, বা কাজ, তার কাছে আমার বা তোমার ব্যক্তিগত সেন্টিমেণ্টের দাম কি? আর দলের প্রত্যেকএর ব্যক্তিগত—সেন্টিমেণ্টের দামই যদি কেবল কোন দল দিতে বসে, তবে সে দলকে দিয়ে আর যাই হোক বড় কাজ কিছু হয় না। অন্তত সে দলের মুখে "ভারত স্বাধীন করব" একথা সাজে না। তাই মেনে নিলাম। সে খবরটাও দিতে আসতে কিংবা পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আবার পুলিশ তাড়া লাগালে। হ'ল না। যেতে হ'ল কুমিল্লায়। কোথায় রংপুর আর কোথায় কুমিল্লা। কেবল তাড়া খেয়ে, পালাতে পালাতে কোথা দিয়ে যে একবছর পার হয়ে গেল! তারপর যখন এলাম সান্তাহারে মায়ের কাছে, শুনলাম তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তাই রংপুর পর্যন্ত আর গেলাম না। ওটুকু কষ্ট বাঁচালাম আর কি!

স্ত্রী : [এই প্রথম নিজেকে অপরাধী মনে করে। কৈফিয়ৎ দেবার মত করে বলে] অনেক কেঁদেছিলাম। বলেছিলাম—মা, আমাকে কুমারী থাকতে দাও। কত ব্রাহ্ম মেয়ে তো থাকে। বাবা বললেন আমরা ব্রাহ্ম নই। মা বললেন ১৬।১৭ বছরের খেয়ালতো এটা। ও তুই ঠিক ভুলে যাব। আমি ভগবানের কাছে হত্যে দেব। ভগবান যেন তোকে ভুলিয়ে দেন। তখন আমার কতটুকুই বা জ্ঞান! আমিও ভগবানকে ডাকতে লাগলাম—ভগবান, আমাকে ভুলিয়ে দাও। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তাকে যেন আমি ভালবাসতে পারি। [কেঁদে ফেলে]

সত্য : পারো নি ?

স্ত্রী : [মাথা নীচু করে, একটু পরে বলে] অথচ আমি জানি, পৌরুষে বুদ্ধিতে হৃদয়ে ও তোমার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু আমি অনবরত ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়েছি। যা ওর পাওনা ছিল তা দিইনি। আর ও তাই ক্রমে ক্রমে [ঠোঁট কামড়ে একটুক্ষণ বসে থাকে] বিয়ের পর তোমাকে ঘেন্না করতে শুরু করলাম। কত খারাপ কথা ভেবেছি তোমার সম্পর্কে। ভেবেছি তুমি স্বার্থপর, তুমি কাপুরুষ—আর তার পরেই ওকে ভালবাসতে গিয়েছি। [একটু হাসে] আর ও যখন ভালোবাসা নিয়ে এসেছে, ছল ক'রে সরিয়েছি। হিষ্টিরিয়া হ'ল আমার। আর ও গেল একটা—একটা খারাপ মেয়ের কাছে। যখন সম্বিত ফিরে এলো, ফেরাতে চেষ্টা করলাম ওকে। ফেরালামও, ও যে আমাকে সত্যিই ভালোবাসত! কিন্তু আমি মিথ্যের মুখোশ ছাড়তে পারলাম না। ও সেই মেয়ের কথা আমাকে বলতে পারলো। কিন্তু আমি বলতে পারলাম না—তোমার কথা ওকে! আমাকে খুশী করবার জন্যে ও কত চেষ্টাই না করতে লাগলো। আমিও যে কবে অফিসার গৃহিণী হয়ে গেছিলাম জানি না তো! সেই পার্টি, সেই ফ্যাসন্ তার মধ্যেই একদিন দেখি বেশ দুরন্ত হয়ে গেছি। তারপর বাপ্পু এল। আর কিছু মনে রইল না। মনে হ'ল সংসারের সবদিক সামলাতে হবে। চাকুরীর উন্নতি চাই। লোকটাকে হাতে রাখা চাই। আর তোমার স্মৃতি রইল পলিটিক্যাল লোকদের সম্পর্কে একটা ঘেন্নার মধ্যে [একটু চুপচাপ]

সত্য : যদি পার আমাকে মাপ কোরো।

স্ত্রী : না, না, তোমাকে মাপ করা না করার কি আছে! আমি নিজেই পারিনি নিজের মন ঠিক করতে। তোমার কি দোষ। [বাইরে

দূরে কোথাও গোলমালের আওয়াজ পাওয়া যায়। দুজনেই সচকিত হয়ে ওঠে]

সত্য : কাউকে ডাক। তোমার স্বামীকে খবর দিক। খামাকা অন্ধকারে হয়ত নদীর ওপারে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কি হ'ল? খবর পাঠাও? এই সময়ে নদীর ওপারে সাপের উৎপাত কিন্তু খুব বেশী। কৈ ডাক কাউকে!

স্ত্রী : না, তুমি এই সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাও [দ্রুত গিয়ে সেই দিকটা দেখে আসে।] সামনে ঠিক এক্ষুণি কেউ নেই। যে বেয়ারাটা ছিল, গোলমাল শুনে বোধহয় নদীর দিকে চলে গেছে। তুমি বেরিয়ে পড়। দেরি কোরোনা। কি হ'ল? বলছি সামনে কেউ নেই! এমন কি, তুমি স্টেশন পর্যন্তও চলে যেতে পার।

সত্য : হঠাৎ মত বদল হ'ল কেন? ছেড়ে দিতে চাইছ কেন? হঠাৎ

স্ত্রী : কেন? আমি ঠিক বলতে পারবো না, কেন। কিন্তু এটাই করা উচিত বলে মনে হচ্ছে।

সত্য : আজকের উচিত কাল আবার ভুল বলে মনে হবে। তখন? তখন কি করবে? তোমার ছেলের, তোমার স্বামীর, তাদের কী হবে? ঝোঁকের মাথায় একাজ তুমি কোরো না।

স্ত্রী : আমি অত ভাবতে পারছি না। কেউ জানবার আগে তুমি চলে যাও।

সত্য : নাঃ, আর তা হয় না।

স্ত্রী : নিজে ফাঁসিকাঠে ঝুলে আমার উপকার করে যাবে?

সত্য : না, তাও ঠিক নয়। কমলা, আমি মুক্তি চাই না। মনে মনে অনেকদিন থেকেই আমি ক্লান্ত হয়েছিলাম, আজ তোমার ঐ একটা কথায় চমক লাগল আমার—আগেরই মত নেতাদের বুলি কপচে চলেছি!—সত্যিই তাই। নিজে আর ভাবতে পারি না।

তাই অন্ধের মত যে কোন কাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু সফল হয়েছি কটা জায়গায়? আজ সাঁইত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল। কি করতে পেরেছি আমি? কতটুকু? এখন পলিটিক্স করি অভ্যাসে। হয়ত আর কোন কাজ করবার যোগ্যতা নেই বলে। আমার মত একটা লোক চলে গেলে। হয়ত বিশেষ ক্ষতি হবে না। সরকারের কাছে আজ আমার যে দাম আমার দলের কাছে তো আমার সে দাম নেই; আমি তো জানি। আজ আমাকে ওরা সহ্য করে। এই তল্লাটে আমার প্রতিপত্তি একদিন ছিল বলেই ওরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে, নইলে দলের বড় বড় মিটিং-এ ডাকেও নাতো আমাকে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে না কিছু। খালি হুকুম করে। আর আমি কাজ করি। সেই কবে একবার হুকুম মানা অভ্যেস করেছিলাম, তাই এখনও মানি, অভ্যাসে মানি!

স্ত্রী: আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমিতো এত অকাজের ছিলে।

সত্য: কি জানি। ছিলাম নিশ্চয়ই। না হলে হলাম কেমন করে? যদি তোমারও একটু উপকার হয়। তাহলে মন্দ কি?

স্ত্রী: তোমার ফাঁসিকাঠের ওপর আমার উপকার হয়ে কাজ নেই। এতে আমার উপকার হবে না। কেবল এক অশান্তির সমুদ্র থেকে আমাকে আর এক অশান্তির সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। না, তা আমি চাই না। আমি চাই না।

সত্য: শুধু তোমার উপকারই বা কেন? এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল এরপর এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি কি ঠিক আগের মতই কাজ করতে পারবো? আমার সন্দেহ হচ্ছে। আর তা যদি না পারি। তবে এই বিভক্ত মনটা নিয়ে—আমিতো দলের বোঝা হয়েই থাকবো। তাতে লাভ? তার চেয়ে এটা একটা

বেশ বীরোচিত সমাপ্তি হবে! (হাসে) আর, তাছাড়া যে দারোগার চার্জে আমি ছিলাম তার চাকরীও তো যেতে পারে।

স্ত্রী : যেতে পারে না, সত্যি যাবে। কিন্তু—

সত্য : বড় ভালোমানুষ ঐ সাহা। সত্যি ওর দারোগা হওয়া উচিত হয়নি। ও অত ভালো না হলে আমি পালাতে পারতাম না। দুপুরে যখন বাড়ি যাচ্ছে তখন বল্‌লে, "আমার স্ত্রীর খুব অসুখ, আমি একটু বাড়ি যাচ্ছি।" যেন আমি ওর ওপরওয়ালা। তারপর রসিকতা করে এও বলেছিল—"পালাবেন না যেন! তাহ'লে আমি জানে প্রাণে মরব।" তবু আমি পালালাম।

[বাইরের দিক থেকে যেন কার পায়ের শব্দ শোনা যায়। সত্যপ্রিয় উঠে যেন অভ্যাস বশতই একটু সরে যায় দরজার আড়ালে। প্রবেশ করে সাহা! শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপর বলে—]

সাহা : আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম,—মানে—[ভিতর দিক থেকে কালোর মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—"দিদিগো সর্বনাশ হ'ল দিদি, ছোট দারোগার বৌ মারা গেল।" বলতে বলতে ঢুকে পড়েই থমকে দাঁড়ায়] ঐ কথাটাই বলতে এসেছিলাম আমি। তার সাথে আরো একটু কথা আমার—আমার আর চাকরির দরকার নেই। শুধু আপনার বাড়ির কোন চাকরকে দিয়ে যদি ছেলেদের ক্লাবে একটা খবর পাঠান,—মানে, ওকে তো শ্মশানে মানে—আমি বাড়ি যাই, ও একলা আছে। [এমন সময়ে কালোর মার চোখ পড়ে সত্যপ্রিয়র দিকে। অস্ফুট চীৎকার ক'রে ওঠে। কালোর মার চোখ অনুসরণ করে। সাহা সত্যপ্রিয়কে দেখে]

সাহা : সেই ধরা দিলেন, একটু আগে যদি দিতেন—মানে তাহলে ওকে

একলা মরতে,—মানে—ও হয়ত শেষ সময়ে কিছু বলতে চেয়েছিল—(চলে যায়)

সত্য : কত সহজ মরা। অথচ—

স্ত্রী : কিন্তু তুমি পালাও—[হাত ধরে]

সত্য : না খবর পাঠাও। কেন অনর্থক দেরি করছ ?

[স্ত্রীর চোখ পড়ে কালোর মার দিকে। উপলব্ধি করে কালোর মার সামনেই সে আগন্তুককে তুমি বলেছে, হাত ধরেছে। কৈফি-য়তের ভঙ্গীতে বলে]

স্ত্রী : মনে পড়ছে তোমার কালোর মা ? রংপুরের বাড়িতে একবার দেখেছিলে ?

কালোর মা : কে ? [একটু কাছে এগিয়ে যায়।] সত্যদাদা ? তাই বলি। বললাম না তোমারে দিদি। দুধআলাটা বল্‌তেছিল, গরীবের পরে খুব টান ! আমারে চিন্‌তি পারতিছ ?

সত্য : হ্যাঁ পারছি। কিন্তু তোমার সাহেবকে খবর দাও। বল যে—

স্ত্রী : না, তুমি পালাও [অপ্রকৃতিস্থর মত বলে] কালোর মা। একথা কাউকে যেন বোল না।

সত্য : ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আমার যে ফাঁসী হবেই। এটা নিশ্চিত ব'লে ধরে নিচ্ছ কেন ? হলই না হয় কিছুদিন শ্রীঘর বাস। ভালোই তো। বিশ্রাম হবে একটু।

স্ত্রী : না, না, তা হয় না। ওকে আমি কি বলব ? না না, সে হবে না। তুমি যাও। কালোর মা, আমার ঘর থেকে টর্চটা নিযে এসো। [কালোর মা ভিতরে যায]

সত্য : [অবাক হয়ে] তুমি হঠাৎ এরকম ব্যবহার করছো কেন ? 'আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

স্ত্রী : [সত্যর হাত ধরে] তোমায় পায়ে পড়ি, তুমি যাও। তোমাকে

এখন কালোর মা চিনে ফেলেছে। আর তো আমি ওকে বানিয়েও কিছু বলতে পারবো না।

সত্য : [স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখে] এরকম করছ কেন? কি বানিয়ে বলবে ?

স্ত্রী : দোহাই তোমার, কিছু জানতে চেও না। তুমি চলে যাও। তোমার পায়ে পড়ি [ঠেলতে থাকে দরজার দিকে] সাহা তোমাকে দেখে গেছে, আর সময় নেই। [সত্য ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে] : "কমলা [এই কথার মাঝখানে স্বামী বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকে দাঁড়ায় ওর হাত ধরা অবস্থাতেই ফিরে তাকায়]

স্বামী : [ঢোক গিলে, যেন যন্ত্র চালিতের মত বলে] সাহা খবর দিলে ও নাকি আত্মসমর্পণ করতেই এসেছি।

স্বামী : [দুজনেরই দিকে তাকায় কিন্তু আপনি, উর্মি, আমি ঠিক

সত্য : উর্মি ?

স্বামী : [আঙুল দিয়ে স্ত্রীর দিকে দেখায়] আমার স্ত্রী! [তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে, কি যেন বোঝে কালোর মা টর্চ নিয়ে আসে] কালোর মা, একগ্লাস জল আনো তো। বসুন নিরবধিবাবু উর্মি, আর বোধ হয় এগুলোর দরকার নেই। তুলে রাখ [বেল্টশুদ্ধ রিভলবারটা স্ত্রীর হাতে দেয়] দাঁড়িয়ে রইলেন কেন নিরবধি বাবু, বসুন ? [দুজনেই দুটো চেয়ারে বসে] আপনিই কি ?

সত্য : সত্যপ্রিয় মুখার্জী।

স্বামী : না, আমি বলছি, আপনি উর্মিকে চিন্তেন ? [স্ত্রী ভেতরের দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়। তারপর ভেতরে চলে যায়।]

সত্য : হ্যাঁ, ছোটবেলায় আলাপ। ওর বাবা আর আমার বাবাতে খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

স্বামী : হ্যাঁ, তাই শুনেছি। তাই আপনার আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা উর্মি ঠিক সহ্য করতে পারছিল না। আপনাকে পালিয়ে যেতে বলছিল তো বার বার। বেচারা!

সত্য : কমলার মনটা বরাবরই একটু নরম কিনা।

স্বামী : হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে। আর আপনি তো ছোটবেলা থেকে দেখছেন। বেশীই জানবেন। আচ্ছা, আপনি তো প্রথম জীবনে অ্যানারকিস্ট ছিলেন, না?

সত্য : আপনাদের রিপোর্টে-তো সব কথাই আছে অরুণবাবু এবং ডিটেল-এই আছে। আবার কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

স্বামী : নাঃ, সব কথা কি আর রিপোর্টে থাকে সত্যবাবু। থাকে না। কত কথা জানতে হবে এখন?

সত্য : তার মানে?

স্বামী : উর্মির মনটা সত্যিই নরম। আরেকবারও তো ওদের বাড়ি থেকে আপনার পালাবার ব্যবস্থা উর্মিই করে দিয়েছিল তাই-না? [ভেতরের ঘর থেকে গুলির আওয়াজ আসে। কালোর মা জল নিয়ে এসেছিল, গ্লাস প'ড়ে যায় তার হাত থেকে। সত্য আর স্বামী ভেতরে ছুটে যায়। কালোর মা দরজার কাছে গিয়ে কি দেখে চীৎকার করে মুখ ঢেকে ফেলে। একটু পরে স্বামী ও সত্য বেরিয়ে আসে।]

স্বামী : কালোর মা, ইসমাইলকে বল ডাক্তারবাবুকে ফোন খবর দেয়। খুলি উড়ে গেলে কেউ বাঁচে না তবু ডাক্তারকে তো খবর দিতেই হবে। [কালোর মা চলে যায়। বাইরে অনেক পায়ের শব্দ আর গুঞ্জন শোনা যায়, দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে স্বামী বলে।]

স্বামী : না, ভেতরে আসতে হবে না কাউকে। যান চলে যান সবাই।

মহাদেব, বাগানের এদিকে কেউ যেন না আসে। বসুন সত্যবাবু !

সত্য : অ্যাঁ ? হ্যাঁ

স্বামী : কিন্তু কেন ? কেন ও একাজ করলো ? এত তাড়া করলো কেন ? আমি আপনাকে তো ছেড়েই দিতাম।

সত্য : বসুন অরুণবাবু, একটা গল্প বলি আপনাকে। হ্যাঁ গল্পই। আজ এটা গল্প। যে গল্প আপনার রিপোর্টে নেই সেই গল্প।

[স্বামী একটা চেয়ারে বসতে থাকে। পর্দাও নেমে আসে]

ইঁদুর

নাটকের চরিত্রলিপি

ডাক্তার অমল চৌধুরী।

জগন্নাথ (চাকর)।

জনৈক ভদ্রলোক।

হালিম।

হরি।

১ম ভদ্রলোক।

২য় ভদ্রলোক।

শিবানী।

ডাক্তারের মা।

বস্তিবাসী আরও অনেক লোক।

ইঁদুর

[ডাক্তারের বাড়ির একতলায় ডাক্তারের চেম্বার। সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার অমল চৌধুরী। প্রতিপত্তি হয়েছে, পয়সা হয়েছে, আর বয়সও হয়েছে কিছু। একজন রোগীর প্রেসক্রুপশন লিখে দিলেন, সে চলে গেল। স্লিপগুলো দেখলেন। খাস চাকর জগন্নাথ পেছনে এসে দাঁড়াল।]

ডাক্তার : আর ক'জন আছেরে ?

চাকর : তা জনা চারেক।

ডাঃ : কাল আসতে বল্ সবাইকে, শরীরটা ভাল নেই। ভাল লাগছে না।

[চাকর বেরিয়ে যায়। ডাক্তার উঠে দাঁড়ায়। ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে। অনেক টাকা। চাকর ফিরে আসে।]

চা : সেই ছবিওয়ালা এসেছে।

ডাঃ : কে ?

চা : সেই যে বৌদিমণির ছবি করবে বলে নিয়ে গিয়েছিল।

ডাঃ : ওঃ। তা ছবি নিয়ে এসেছে ?

চা : এঁজ্ঞে। হ্যাঁ

ডাঃ : আসতে বল্।

[চাকর বেরিয়ে যায়। ডাক্তার টাকাগুলো পকেটে রাখে। চাকর ও ভদ্রলোক ঢোকে। একটা বেশ বড় সাইজের অয়েল পেন্টিং চাকর বয়ে নিয়ে আসে। রাখে। আবার যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

ভদ্রলোক : নমস্কার স্যর। আপনার অয়েল পেন্টিংটা

ডাঃ : বিলটা ?

ভদ্র : এই যে স্যর !

ডাঃ : (বিলটা দেখে) প্রসাদবাবুকে বলবেন কাল পাঠিয়ে দেব।

ভদ্র : একবার দেখবেন না স্যর? প্রসাদবাবু নিজে আসতে পারলেন না বলে আপনাকে বার বার বলতে বলে দিয়েছেন! ছবিখানা একবার দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন প্রসাদবাবুর হাত।

ডাঃ : অত বড় আর্টিস্ট ভাল হাত তো হবেই!

ভদ্র : খুলে দেব স্যর দেখবেন? আপনার মনে হবে উনি যেন জীবন্ত হ'য়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডাঃ : আমার সময় হ'লেই আমি দেখব।

ভদ্র : না, মানে কি জানেন! অতীতটা মানে যে অতীতটাকে মানুষ ভালবাসে, তাকে তো চায়, ভুলতে তো চায় না মানুষে।

ডাঃ : এঁ্যা? ন', সব সময় তা হয় না!

ভদ্র : হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্ষেত্রবিশেষে তা হয় না। এই ধরুন না—সব সময় মানুষ কিছু অতীত ধরে বসে থাকতে পারে না। বিশেষ করে,—যারা কর্মবীর, যাদের—

[চাকর এসে ঢোকে, ডাক্তার তাড়াতাড়ি]

ডাঃ : কি জগন্নাথ?

জগ : বাবু একজন মেয়েছেলে—বলছে আপনার সঙ্গে তার ভারী দরকার।

ডাঃ : দরকার?

জগ . আমি অনেকবার বললাম যে আজ আর তিনি—!

ডাঃ : নিয়ে এস। (ভদ্রলোককে) আপনি তাহলে আসুন!

ভদ্র : (উঠে) আচ্ছা তাহলে প্রসাদবাবুকে তাই-ই বলব যে আপনার খুব পছন্দ হয়েছে—আচ্ছা নমস্কার!

ডাঃ : নমস্কার!

[একটি গরীব স্ত্রীলোক চাকরের সঙ্গে ঢোকে। ঘোমটা দেওয়া, আজকালকার তুলনায় ঘোমটাটা একটু বেশী মনে হয়। স্ত্রীলোকের পরনে

কালো শাড়ী। চাকর আবার বাইরের দিকে চলে যায়। ডাক্তার একটু ইতস্তত করে বলে]

ডাঃ: বসুন ঐ চেয়ারটায়।

[স্ত্রীলোকটি বসে না]

ডাঃ: কি, কি দরকার আপনার ?

[স্ত্রীলোকটি এবার ঘোমটাটি খানিকটা তুলে দেয়।]

ডাঃ: কে কে তুমি ?

স্ত্রী: ভাল করে দেখ।

ডাঃ: তুমি !! কোথা থেকে এলে তুমি ? একি দশা হয়েছে তোমার ? কি করে তোমার এ অবস্থা হ'ল ?

[ক্লান্ত স্ত্রীলোকটি একটু হাসবার চেষ্টা করে]

স্ত্রী: এর চেয়েও খারাপ অবস্থার লোক আছে !

ডাঃ: বোস বোস। ভাল করে তোমার দিকে দেখতে দাও !

[এইবার স্ত্রীলোকটি একটা চেয়ারে বসে]

ডাঃ: কি করে, কি করে তোমার এই অবস্থা হল—আমি বুঝতে পারছি না। কেন কেন তুমি এমন করে নিজের ক্ষতি করলে ?

স্ত্রী: আমি করলাম কে বললে ?

ডাঃ: তুমি করলে না তো কে করলে ? কেন তুমি তখন বিয়ে করতে রাজী হ'লে না ? কেন তুমি—

স্ত্রী: আমি তোমার কাছে এসেছিলাম একটা দরকারে !

ডাঃ: এড়াতে চাচ্ছ ? কিন্তু না আজ তোমাকে বলতেই হবে। কেন সেদিন তুমি বাড়িতে ছিলে না ! কেন ঠিকানা না জানিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলে ! কেন ?

স্ত্রী: আমার দরকারটা শুনবে না ?

ডাঃ : শুনব, নিশ্চয় শুনব। কিন্তু তুমি কথা দাও আমাকে বলবে সব। কথা দাও।

স্ত্রী : সে গল্প শুনে এখন কি হবে ?

ডাঃ : গল্প ?

স্ত্রী : তবে কি ইতিহাস ?

ডাঃ : উঁ ? হ্যাঁ তাই। আমাকে জানতে হবে কোন্ ঐতিহাসিক কারণে আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে আমি বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে বিলেত ফেরত ডাক্তার হলাম,—আর, আজ এই রাত্তিরে অসম্ভব দারিদ্র্যের চিহ্ন বহন করে তুমি আমার কাছে এসেছ একটা 'দরকারে'। কেন ?

স্ত্রী : তুমি যে বড়লোক! তুমি যে ডাক্তার।

ডাঃ : ওঃ। কিন্তু বুঝতে পারছি না তোমার কথা, বড়লোক বলে এসেছ না ডাক্তার বলে ?

স্ত্রী : বড়লোক বলেও আবার বলতে পার ডাক্তার বলেও।

ডাঃ এখনও সেই হেঁয়ালি ক'রে কথা বলবার স্বভাবটি ত' যায়নি!

স্ত্রী : (একটু হেসে) কথায় বলে না স্বভাব যায় না মলে।

ডাঃ : ওঃ তাহলে তোমার স্বভাবের তলায় জীবনের ইতিহাস চাপা পড়ল! বেশ বল, কেন এসেছ তাই বল!

[স্ত্রীলোকটি কি বলবে কি দিয়ে শুরু করবে যেন বুঝতে পারে না। একটা অসহায়ত্ব পেয়ে বসে তাকে]

ডাঃ : আজ পনের বছর পরে এসেও তোমার যখন আমার সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হ'ল না, বা তোমার—

স্ত্রী : বাঃ তোমার কথ ত মাঝে মাঝে কাগজেই দেখতে পাই।

ডাঃ : কাগজ পড় ?

স্ত্রী : হ্যাঁ যেদিন পাই। কিনতে তো পারি না। এত বাজে খবর

দেয়। তার চেয়ে তোমায় কথা আর একটু বেশী করে দিলেই পারত।

ডাঃ তার মানে বেশ খুঁটিয়েই কাগজ পড় আজকাল তাহলে? আমার খবর তো কাগজের এমন জায়গায় থাকে না যে খুললেই চোখে পড়বে!

স্ত্রী: সেই জন্যেই তো খুঁটিয়ে পড়ি! কিছুদিন আগে তোমার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার খবর পড়লাম। মাসীমা মানে তোমার মায়ের নাম কি উমাসুন্দরী ছিল?

ডাঃ: না, আমার শাশুড়ীর নামেই হাসপাতালটা হয়েছে। উমাসুন্দরী আমার শাশুড়ীর নাম।

স্ত্রী: ওঃ উনি মারা গেছেন নাকি? চমৎকার দেখতে ছিলেন না?

ডাঃ: তার মানে? তুমি তাঁকে দেখেছ? তুমি তাঁকে চিনতে?

স্ত্রী: (ত্রস্তে) বাঃরে আমি তাঁকে কি করে চিনব! হ্যাঁ আমি যে জন্য এসেছিলাম!—আমি—

ডাঃ: দাঁড়াও! তবে তুমি কি করে জানলে যে তিনি চমৎকার দেখতে ছিলেন?

স্ত্রী: কেন? কাগজে ছবি বেরিয়েছিল যে!

ডাঃ: ছবি? কোন কাগজে?

স্ত্রী: কি জানি! প্রা-য় একবছর আগের কথা! এতদিন বাদে কি তা মনে থাকে? তাছাড়া আজ এর কাছ থেকে কাল ওর কাছ থেকে কাগজ চেয়ে পড়ি! সকলে তো আর এক কাগজ রাখে না!

ডাঃ: কিন্তু নাঃ। কোন কাগজের লোক তো ছবি নিয়ে গেছে, বা তাদের ছবি পাঠান হয়েছে বলে মনে পড়ছে না!

স্ত্রী: তোমার মনে নেই হয়তো।

ডাঃ : তুমি মিথ্যে বলছ ছবি তুমি দেখনি !

স্ত্রী : তাই হবে !

ডাঃ : ঠিক আর একদিন যেমন চিঠি লিখেছিলে !

স্ত্রী : কোন্ চিঠি ?

ডাঃ : সেই কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে, যে টাকার তোমার খুব দরকার তাই—

স্ত্রী : (একটু যেন আনন্দে) সে চিঠি তুমি বিশ্বাস করনি ?

ডাঃ : না করিনি, করতে পারিনি ! লোক চিনতে অত ভুল করি না আমি ! আর আমি যে ভুল করিনি তার প্রমাণ আজকের তোমার এই অবস্থা। টাকার জন্যেই যদি আমাকে বাতিল করেছিলে তাহলে আজ তোমার এই অবস্থা কেন ?

স্ত্রী : ভাগ্যে হ'ল না যে !

ডাঃ : কেন, কেন ভাগ্যে হ'ল না ? সে কথা জানবারই তো কৌতূহল আমার। বল—কেন হ'ল না ?

স্ত্রী : পুরো পনের বছরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার বলতে গেলেও যে রাত পুইয়ে যাবে।

ডাঃ : বেশ তো—পোহাক।

স্ত্রী : খুব সাহস যে ! কিন্তু না ওসব বাজে কথা ছাড়ো। হ্যাঁ শোন— আমাকে কিছু টাকা দিতে পার ?

ডাঃ : টাকা ? তুমি কি টাকার জন্যে আমার কাছে এসেছ ?

স্ত্রী : (হেসে) তবে কি এতদিন পরে তোমার ভরা সংসার ভাঙতে এসেছি।

ডাঃ : ঠাট্টা কোর না।

স্ত্রী : তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না কেন ? বললুম না তুমি বড়োলোক বলে তোমার কাছে এসেছি !

ডাঃ : ওঃ। কত টাকার দরকার ?

স্ত্রী : কত ? এই—এই একশো।

ডাঃ : কোথায় থাক তুমি ?

স্ত্রী : টাকা দেবে না ? (হাসে) আমার কিন্তু খুব দরকার। না হ'লে ভীষণ বিপদে পড়তে হবে।

ডাঃ : টাকাটা ফেরত দেবার জন্যে কোন ঠিকানায় তাগাদা করব ?

স্ত্রী : তুমি নিজে যাবে তাগাদা করতে ?

ডাঃ : যাব।

স্ত্রী : সর্বনাশ !

ডাঃ : কেন ?

স্ত্রী : লোকে তোমার দুর্নাম করতে পারে !

ডাঃ : কেন ?

স্ত্রী : আমার যে দুর্নাম আছে গো !

ডাঃ : শিবানী !!

স্ত্রী : না পারুল। আমার নাম এখন পারুল।

ডাঃ : কি হেঁয়ালি করে কথা বলছ শিবানী ? যারা জোচ্চোর তাদের নাম পাল্টাবার দরকার হয় কিন্তু—

শি : বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না ? সত্যি তাই। আমার বৃত্তির সঙ্গে শিবানী নামটা নিজের কানেই বড় বাজতে লাগল তাই--

ডাঃ : শিবানী !

শি : টাকাটা একেবারে দিয়ে দিতে পার না ? একেবারে ? ধারের জন্যে তোমার কাছে আসিনি। আমি বড় ক্লান্ত। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

ডাঃ : কোথায় তোমার বাড়িতে ?

শি : বাড়ি আমার নেই। একটা ঘর ছিল সেটাও আজ—

ডাঃ : কি ? সেটাও আজ ?

শি : ছেড়ে দেব কিনা ভাবছি।

ডাঃ : ভাড়া বাকী পড়েছে ?

শি : উঁ ? হ্যাঁ।

ডাঃ : আচ্ছা একটা কথার জবাব দাও। এরকম টাকার দরকার তোমার নিশ্চয়ই আরও হয়েছে—এবং টাকা দেবার লোকও নিশ্চয়ই ছিল। তাহলে আজকে এক যুগ পরে আমার কাছে আসবার দরকার পড়ল কেন ?

শি : আজ আর কেউই নেই যে। আজ বিপদে প'ড়ে যখন মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগলাম তখন দেখলাম তুমি ছাড়া আর আমার কেউই নেই।

ডাঃ : বিয়ে করনি তুমি ?

শি : হ'য়ে উঠল না।

ডাঃ : বুঝতে পারছি সেই চাকরি তোমার নেই। তোমার সংসারে এখন কে কে আছে ?

শি : সংসার ? একা একা সংসার হয় নাকি ?

ডাঃ : তোমার বোনেরা ? ছোট ভাই ?

শি : জানি না। ভালই আছে বোধ হয়।

ডাঃ : তার মানে তারা তোমার কোন খোঁজ নেয় না ? তাদের না তুমি মানুষ করেছিলে ?

শি : কিন্তু তারা যে জেনে ফেলল তাদের মানুষ করবার জন্যে আমাকে চরিত্রভ্রষ্ট হ'তে হয়েছে।

ডাঃ : ভাল মানুষ হয়েছে তারা !

শি : হ্যাঁ, ওরা ভালো মানুষ। কোনরকম ঝামেলা বহন করবার ক্ষমতাও ওদের নেই।

ডাঃ : কিন্তু তারপর ? তারপর কি করলে ?

শি : ডাক্তারী পড়েছিলে না ওকালতী ?

ডাঃ : বলবে না ?

শি : শুনবে ? —তারপর —তারপর —দেখলাম মনের কতকগুলো সংস্কার কাটিয়ে ফেললে এই কলকাতা শহরে স্ত্রীলোকের খাওয়া-পরার কোন কষ্ট হয় না। অন্ততঃ প্রথমটায়। প্রথমে জোটে অ্যাড্‌মায়ারার, তারপর মালিক, তারপর অনেক মালিক—তারপর—

ডাঃ : চুপ কর।

শি : এই দেখ, তুমিই তো জানতে চাইলে।

ডাঃ : কি তোমাকে বলব বুঝতে পারছিনে। কিন্তু শিবানী এর জন্যে তুমি নিজেই কি দায়ী নও ? কেন তুমি আমাকে সেদিন প্রত্যাখ্যান করলে ? না হলে আজ এই সংসার তো তোমারই হবার কথা ?

শি : নাঃ। সে তাহলে হয়তো সেই গরীব ছোট্ট, হয়তো সরকারী ডাক্তারের সংসার হ'ত। বড়লোক বিলেত-ফেরত ডাক্তারের হ'ত না ত!

ডাঃ : ওঃ। তাহলে সত্যি!

শি : কি সত্যি ?

ডাঃ : আমার টাকা ছিল না ব'লে তোমার মন ওঠেনি। গরীব হবু ডাক্তারকে ভালবাসতে পারনি।

শি : ভালবাসতে পারিনি ?

ডাঃ : হেঁয়ালি কোর না। আমি জানি তোমার অভিভাবক তুমি নিজে ছিলে। আর আমি জানি যে তোমার দিক থেকে কোন বাধা ছিল না। তাহলে ? স্বীকার কর যে তোমার মনে দ্বিধা ছিল। সেটা কি সেই টাকার জন্যেই ?

শি : টাকার পেছনেই তো এতদিন ছুটে বেড়ালাম।

ডাঃ : অথচ আজ তোমার এই অবস্থা। এর দায়িত্ব কি সম্পূর্ণ তোমারই নয় ?

শি : আমি কি একবারও বলেছি যে আমার এই অবস্থার জন্যে আমি দুঃখিত ?

ডাঃ : তুমি দুঃখিত নও ?

শি : না।

ডাঃ : তোমার বিবেক নেই ? যে জীবন-যাপন করছ তুমি—তোমার অনুতাপ হয় না ?

শি : তুমি কি ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রিচ করছ ? আমাদের বস্তিতে মাঝে মাঝে ওরা এইরকম সব কথা বলতে আসে।

ডাঃ : তুমি কি বস্তিতে থাক ? তুমি কি—

শি : বস্তির বেশ্যা।

ডাঃ : শিবানী !! ·· তবু তুমি বলবে, তুমি দুঃখিত নও।

শি : না নই !

ডাঃ : তুমি নির্লজ্জ।

শি : লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ—বেশ্যার নয় ! ওটা তোমার স্ত্রীর জন্যেই তোলা থাক্। বেশ্যার লজ্জা করলে চলে না !! আচ্ছা যাই !

(উঠে দাঁড়ায়)

ডাঃ : দাঁড়াও ! টাকা নেবে না !

শি : (গলাটা খুব ক্লান্ত আর পাতলা শোনায়) না থাক।

ডাঃ : একটা কথা জেনে রেখ রাণী, ভদ্রলোকের স্ত্রীদের বিদ্রূপ করলেই তোমার গৌরব কিছু বাড়ে না বা অপরাধের পরিমাণ কম হ'য়ে যায় না।

শি : অপরাধ ? তুমি—তুমিও আজ এই কথা বলবে ? অথচ জান কি—যে তোমার জন্যে—

ডাঃ : নিজেকে দেবদাসের মেয়ে সংস্করণ তৈরী করলে ?

শিঃ : কথাটা মন্দ বলনি। দেবদাসের মেয়ে সংস্করণ! (একটু আনমনা হ'যে যায়) দেবদাস শ্রীকান্ত, ঘরেবাইরে, আরও কত— একদিন আমিও পড়েছিলাম না ? (হাসে) আমি ত' খবর রাখি না। তুমি কি এমন কোন শরৎচন্দ্রের কথা জান—যিনি দেবদাসীর গল্প লিখবেন বা লিখতে পারেন ?

ডাঃ : (একটু অভিভূত) বাণী, তোমাকে আমি আঘাত করতে চাইনি।

শিঃ : (আনমনা ভাবেই) কেন চাওনি ? ভালই তো !! তবু তো মনে পড়ে গেল! আমি তো শরৎবাবু রবিবাবু সব ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। বই কিনে নিয়ে গেলে হত। সে দেশে হয়ত পাওয়া যাবে না।

ডাঃ : কেন তুমি কোন্ দেশে যাচ্ছ ?

শিঃ : আচ্ছা এত রাত্রে কি বইয়ের দোকান খোলা থাকে ?

ডাঃ : (একটা চেয়ার শিবাণীর দিকে ঠেলে দেয়) শিবাণী, বোস। আমার মনে হচ্ছে তুমি প্রকৃতিস্থ নও।

শিঃ : (মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে—সমস্ত পৃথিবীর ওপর যেন অভিমান) না আমি প্রকৃতই সুস্থ! আমি যেখানে থাকি সেখানে আমি বেমানান নই। আমি যেখানে যাব সেখানে আমি বেমানান হব না। তোমাদের কথায় আমার কিবা এসে যায় —আচ্ছা ডাক্তার সাহেব চলি !

ডাঃ : না দাঁড়াও ! টাকা নিয়ে যাও।

শিঃ : থাক দরকার নেই।

ডাঃ : কিন্তু সেই জন্যেই কি তুমি আস না ?

শিঃ : না—সবটাই তাই নয়! ওই কথাই তোমাকে বলা সহজ ছিল তাই বলেছি।

ডাঃ : তবে কি জন্তে এসেছিলে? বল। না বলে তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। বল।

শি : তোমাকে দেখবার দরকার ছিল! (একটু তিক্ত হাসি আসে মুখে) আমার পক্ষে দরকার ছিল। দেবদাসের যেমন মরবার আগে পার্বতীকে একটিবার দেখবার দরকার পড়েছিল, সেই রকম আর কি! দেখা গেল দেবদাস বেচারা আমার চেয়েও দুর্ভাগা।

ডাঃ : তুমি কি মরতে যাচ্ছ?

শি : বালাই ষাট। আমি মরতে যাব কোন দুঃখে। ঠাট্টা বোঝ না? দেবদাসের কথ তুমি তুললে, শুনতে ভাল লাগবে বলে বললাম কথাগুলো।

ডাঃ : কিন্তু কোথায় যাচ্ছ তুমি?

শি : তোমার তা জেনে তো কোন দরকার নেই। যাবার আগে একটা চেনা লোককে—একটা ভাল লোককে দেখতে এসেছিলাম —তা আমার ভুল ভাঙল। এবার তোমার ভুলটা ভেঙে দিয়ে যাই

ডাঃ : ভুল?

শি : হ্যাঁ। আমার কথা মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে আমাকে মেয়ে দেবদাস বলে বিদ্রূপ করলে তুমি। এবং তার পরেই দেখলাম আমার জন্তে তুমি করুণা অনুভব করলে। ভাবতে একটু ভাল লাগল, না?—যে, তে.মারই কথা ভেবে ভেবে একজনের এমন অবস্থা হয়েছে! কিন্তু তু'ম ভুল করলে। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার এই অবস্থার জন্ম দায়ী তুমি—

ডাঃ : আমি? কি করে?

শি : তু ম এবং তোমার সংসার।

ডাঃ : আমার সংসার? ~ার মানে?

শি : মানে ?—তুমি দায়ী এই জন্যে যে—আমি কলকাতা ছাড়বার তিনমাসের মধ্যে বিয়ে তো করলে তুমি !

ডা: : কিন্তু তুমি তো নিজেই সেই জন্যে দায়ী—

শি : আর তোমার সংসার দায়ী এই জন্যে যে—থাক, তোমার শাশুড়ী বেঁচে নেই, তোমার স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা কোর।

ডা: : স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবার সুবিধা হবে না। তুমিই বল।

শি : জিজ্ঞাসা কোর, আর যদি তাদের সত্যি কথা বলবার সাহস থাকে—তাহলে তারা বলবে যে—আমারই দয়ায় তোমার এবং শীলাদেবীর এই সুখের সংসার! আর আমাকেই ব্যঙ্গ করছ তুমি? আর যে জন্যেই এসে থাকি তোমার বিদ্রূপ—! অবশ্য এও জানি ব্যঙ্গ করাটা খুব সহজ—খুব সহজ।

ডা: : আমি কিছু বুঝতে পারছি না! তোমার দয়ায় মানে? স্পষ্ট করে কথা বল। আমার স্ত্রীকেই কি তুমি ব্যঙ্গ করছ না?

শি : তুমি করালে কেন? কিন্তু এক্ষুনি আমার সবাইকে ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে করছে—তোমাদের মত যত ভালমানুষ সুখী মানুষ আছে, সবাইকে! অ-হা-হা—সেদিন আমার কাছে গিয়ে খুকুমণির কি কান্না!

ডা: : আমার স্ত্রীকে তুমি চেন!

শি : হাড়ে হাড়ে চিনি।

ডা: : (উত্তেজনায়) বোস,—কবে, কবে আমার স্ত্রী তোমার কাছে গিয়েছিল? কাঁদতে? কেন সে যাবে তোমার কাছে? সত্যি কথা বল।

শি : তোমাকে ভিক্ষে চাইতে গো!

ডা: : ভিক্ষে চাইতে? তার মানে? রাবিশ!

শি : হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তখন তো আমার সাথে ভেসে যেতেও পারতে!

নাকি। ওদিকে শীলা, সেও তোমার সাথেই ভাসতে চায়। তাই সমস্যার সমাধান হ'ল। আমি চাকুরে মেয়ে, শক্ত মেয়ে, এ পৃথিবীতে আমি বাঁচতে পারব। কিন্তু সে যে তোমাকে না পেলে মরে যেতো গো। মেয়ে যত কাঁদে মা তত বোঝায়। ভারতের মেয়েদের ঐতিহ্য। ত্যাগের মাহাত্ম্য। তার মধ্যে আবার এক উকিলের চিঠি! ওঃ।

ডাঃ: উকিলের চিঠি?

শিঃ হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার মায়ের চিঠি। বুঝতে পারলে না? তোমার স্বামী-বৌ এর পক্ষে ওকালতী করে লেখা। আজ মনে পড়ে চিঠির শেষ দুটো লাইন। "অমলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কোর ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন" তিন দিক থেকে আক্রমণ। আর আমি একেবারে ভূপাতিত। হিঃ হিঃ হিঃ (হাসতে থাকে)।

ডাঃ: আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এ অসম্ভব! এতদিনের মধ্যেও তাহলে আমি—না—এ—এসব কথা বলার মানে কি? কি মতলবে তুমি এসেছ?

শিঃ একটা ওষুধ দিতে পার? ওষুধ?

ডাঃ: ওষুধ? কিসের ওষুধ?

শিঃ ছেলে নষ্ট করার ওষুধ?

ডাঃ সেইজন্য তুমি আমার কাছে এসেছিলে? ছি ছিঃ।

শিঃ ইচ্ছে করে আঘাত করার জন্যেই যেন) আমার কিন্তু খুব খারাপ রোগ আছে। ছেলেটা বিকলাঙ্গ হ'য়ে জন্মাতে পারে ত?

ডাঃ: (প্রচণ্ড চাপা রাগে) আমি ওসব নোংরা কাজ করি না, চলে যাও এখান থেকে।

শিঃ ছেলেটা জন্মালে,—সমাজের পক্ষে সেটা একটা নোংরা জিনিস হবে না?

ডাঃ: আমি জানি না!

শি: জান না কি গো? সমাজের জন্যে কত ভাল ভাল কাজ করে বেড়াও। কাগজে নাম বেরোয়। আসলে ঠিক কোন্ জিনিসটি করলে সমাজের ভাল হবে, তা জান না?

ডাঃ: তোমার কাছ থেকে শেখবার ইচ্ছে নেই। তুমি যাও।

শি: (ব্যঙ্গে) সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ব্যক্তির বে-আইনী কাজ করতে ভয় করছে?

ডাঃ: তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমারই ভুল হয়েছে, পনেরো বছরের আগের চোখ দিয়ে তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। যে জীবন তুমি যাপন করে এসেছ তাতে এই বদলই তো তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। তোমাকে এতটা প্রশ্রয়—

শি: ঠিক ঠিক! ঐ একই ভুল আমিও করলাম। (হাসে) আজ সকালে ভগবানকে বলেছিলাম—হে ভগবান, যাবার আগে, তোমার অপূর্ব সৃষ্টি এই মানুষ, তা আমাকে একটা আস্ত পুরুষ মানুষ দেখাও। তা ভগবান সারাজীবন ধরে হয় আমাকে পাজী মানুষ দেখাল নয় আমাকে (ব্যঙ্গে) ভাল মানুষ দেখাল, পুরুষ মানুষ দেখালে না গো।

[একটু দূরে একটা গোলমাল শোনা যায়, দুজনেই উৎকর্ণ হয়। গোলমাল কাছে এগিয়ে আসে। চাকর ঢোকে]

চা: বাবু এই বস্তি থেকে একটা লোককে নিয়ে এসেছে—এখানে নিয়ে আসব?

ডাঃ: কেন কি হয়েছে?

চা: কি জানি বাবু—কে নাকি হাতুড়ী না কি দিয়ে মাথায় মেরেছে, ভদ্রলোকের আর রা বেরুচ্ছে না।

ডাঃ: খুব রক্ত পড়েছে?

চা : নাঃ, রক্ত তো দেখলাম না ?

ডাঃ : ভদ্রলোক ? পাশের ঘরে রাখ। কারা নিয়ে এসেছে ? সব জিনিস তৈরী কর।

[বাইরে আওয়াজ আরও বেড়ে উঠেছে। লোকগুলো যেন এই ঘরে ঢুকে পড়তে চায়। শিবানীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। চাকর বাইরে যায়]

শি : (ভয়ে) ওদের কি তুমি এইখানে ডাকবে নাকি ?

ডাঃ : হ্যাঁ।—কেন ?

শি : আমি তাহলে এই ভেতর দিকে গিয়ে অপেক্ষা করব ?

ডাঃ : কেন ? তুমি চলে যেতে পার অনায়াসে !

শি : ওরা চলে যাবার পর আমি যাব। এইটুকু দয়া কর।

ডাঃ : (একটু ভাবে) বেশ। ঐ বারান্দাটায় যাও।

[শিবানী চলে যায়—পাশের ঘরে গোলমালের আওয়াজ। ডাক্তার পাশের ঘরে চলে যায়। একটু পরেই ফিরে আসে। সঙ্গে কয়েকজন লোক, বস্তিরও দুচারজন আছে, আবার পাড়ার ভদ্রলোকও দুএকজন আছেন। বস্তির লোকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দু জাতই আছে। হিন্দি-বলিয়ে মুসলমানও আছে, আবার চব্বিশ পরগনার মুসলমানও আছে]।

১ম ভদ্র প্রাণ নেই ?

ডাঃ : নাঃ। এখানে মিছিমিছি আনলেন। পুলিসে খবর দিয়েছেন ?

২য় ভদ্র : না তো। আমাদের মনে হয়েছিল প্রাণটা আছে, তাই তাড়াতাড়িতে আপনার এখানেই নিয়ে এলাম।

ডাঃ : পুলিসে খবর দিন আগে। ঐ পাশের ঘরে ফোন আছে। যান একজন ফোন করে দিন ! (২য় ভদ্রলোক বেরিয়ে যায়) কিন্তু কি করে হ'ল ?

বস্তির হালিম : ওয়, বাবু বহুত জুলুমবাজ থা ! হামনে কয় দফে মানা কিয়া থা। তো—

বস্তির হরি : তা বাপু বস্তির সব লোক তো সমান না, অনেকে যে আবার তারে নাইও দিত !

১ম ভদ্র : যাঃ যাঃ তোদের বস্তির কথা আর বলিসনি ! ঐ মেয়েটাকে একা একা বস্তির মধ্যে তোরা থাকতেই বা দিলি কেন ? তোদের—

হালিম : নেহি বাবু ওর অওরত খারাব নেহি থী ।

১ম ভদ্র : না । সতীলক্ষ্মী ছিল । খারাব নেহি থী । তাহলে, তার পেছনে লোক ঘুরবেই বা কেন রে ?

ডাঃ : ওঃ স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার !

১ম ভদ্র : স্ত্রীলোক ঘটিত এবং মনে হচ্ছে স্ত্রীলোক দ্বারা সংঘটিত । (নিজেই হেসে ওঠে, রসিকতা করেছে ভেবে)

ডাঃ : (কৌতূহলী) আপনি বলছেন সেই স্ত্রীলোকটিই খুন করেছে ?

১ম ভদ্র : আমার তো তাই মনে হয় । বলেন কেন, যত ছোটলোকের কারবার । একটা একেবারেই থার্ড ক্লাস বেশ্যা—আর এই পলাশ বড়োলোকের ছেলে,—সুতরাং—

হালিম : নেহি বাবু ওর অওরত এ্যায়সা—

হরি : তা বললে কি হবে হালিম ভাই ! আগে ওর বদনাম ছিল, খুবই ছিল ।

খালেক : কিন্তু এখানে এসে ইস্তক কেউ তারে ঠিক—তাছাড়া আমাদের ছেলেমেয়েদের অ আ ক খ শিকোচ্ছিল ।

হরি : তা শিকোচ্ছিল !

১ম ভদ্র : দেখেছেন এরা to the point কথা বলতে জানে না ! খুব তো ভাল ভাল কচ্ছিস, তা পাকিস্থানে পালাবার মতলব কচ্ছিল কেন রে ! বুঝলেন ডাক্তারবাবু this is preplanned আমি শুনলুম আজই এক মুসলমানের সঙ্গে পাকিস্থানে পালাবার মতলব করেছিল । হয়ত এতক্ষণ ভেগেই পড়েছে !

ডাঃ : কে ? যে এই পলাশ চৌধুরীকে খুন করেছে বলে ভাবছেন ?

১ম ভদ্র : ভাববার আর অবকাশ নেই ডাক্তারবাবু। সেই মা—মানে সেই নটোরিয়াস স্ত্রীলোকটিই খুন করেছে। ভেবেছিল বোধ হয়, কিছু টাকা পয়সা হাতিয়ে পালাবে!

ডাঃ : ওঁর পকেট থেকে টাকা পয়সা গেছে দেখেছেন নাকি?

১ম ভদ্র : না, না আমি কেন দেখতে যাব! না হলে আর উদ্দেশ্য কি হতে পারে বলুন!

ডাঃ : যাক্‌গে, উদ্দেশ্যের কথা পুলিস ভাববে, আমাদের ভাববার দরকার নেই। কিন্তু ভাবছি—একটা স্ত্রীলোকের গায়ে এত জোর এল কোথা থেকে। অবশ্য যদি—

হালিম : হমনে ভি ইয়েহি শোচতা থা কি ক্যায়সে—।

হরি : আর পারুল তো রোগা মেয়েমানুষ বললেই হয়।

ডাঃ : কি নাম বললে?

সকলে : পারুল।

(ডাক্তার নিজেকে সংযত করে)

হালিম : ওয় অচ্ছি লড়কী থি ডগদর সাব। মুঝে এ্যায়সা মালুম হোতা কি মজবুরী সে ওয় ইযে কাম কিয়ি হোগী।

ডাঃ : ওঃ। তা কতদিন আগে এ তোমাদের বস্তিতে এসেছিল?

হরি : তা এই মাস পাঁচ ছয় হবে। আমাদের এখানে এসে কিন্তু উনি ভালই ছিল।

ডাঃ : কোন্ জায়গা থেকে তোমাদের এখানে এল?

হালিম : মুঝে বোলনে দিজিয়ে—কিঁউ কি আব তো পোলিস ইকোয়রীমে সবহি নিকল যায়গা! ম্যয় হি লেকর আয়াথা!

১ম ভদ্র : তুমি? তা মতলবটা কি ছিল বাবা?—

হালিম : মতলব এক অওরত কো বাঁচানেকি কৌশিশ কিয়া থা! হাঁ ডগদর সাব ওয় খারাব হি থী!

১ম ভদ্র : পথে এস বাবা।

হালিম : (একটু রেগে) মগর ওয় ভদ্দর পলাশ বাবুসে কম খারাব থী।

ডাঃ : থাক ও কথা। তুমি ওকে তোমাদের বস্তিতে নিয়ে এলে কোথা থেকে ?—

হালিম : দুসরা এক বস্তিসে! উধার কাম কে লিয়ে ম্যয় যাতা থা। মুঝে ওয় চাচা পুকারতিথী। এক রোজ বোলা, চাচা ম্যয় চয়ন সে মরনা চাহাতি! মুঝে বহত তাজ্জব লগা। ম্যয়নে কহা, মগোর বেটী মরণে সে পহলে তো বহত রোজ গুজরনে হোগা—পেট চলেগা ক্যায়সে? তো বলী—কাম করুঙ্গী, কুছ ভী করুঙ্গী— ইয়ে দোজখ সে মুঝে লে চল! উসকী আঁখ দেখ কর মুঝে এ্যায়সা লগা কি—

১ম ভদ্র : ওঃ ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

হালিম : বাবুজী!

ডাঃ : আঃ থামুন না মশাই। শুনতেই দিন না। তারপর ?

হালিম : কেয়া বলুঁ ডগদরজী—ম্যয় উসে লে আয়া থা। ঠোঙ্গা বনাতি থী, সুঁই কা কাম ভি করতি থী—কেয়া হরি ভাই বোলনা ?

হরি : তা বাবু ঠিক! দিন রাত্তির কাজ করত।

ডাঃ : তা এই পলাশবাবু কোত্থেকে এল ?

হরি : ঐ তো মুশকিল! আমাদের বস্তির কথা কি বলবো, লজ্জাও করে।

খালেক : আগে ছিল কি, মানে কসবীদের জন্যি আলাদা জাগা ছিল। তা গরমেণ্ট যেদিন ইস্তক ঐ বেআইনী করে দেল, তা দেখবেন আপনে সব বস্তিতেই দুটো এট্টা ওরম থেকেই গেল। কোতাও বেশী কোতাও কম! তা আমাদের এখানেও ঐ কাঞ্চনী বলে এট্টা মেয়ে, মানে খসম সাথে করেই এল—

হরি : কিন্তু দুদিন বাদেই বোঝলাম যে সে খসম আসলে ঐ আর কি তা ঐ পলাশবাবু ওর কাছেই আসত যেত আর কি।

ডাঃ : তা তোমরা থাকতে দিলে কেন ?

হালিম : কেয়া করেংগে ডগ্দর সাব। দুনিয়া এ্যায়সাহি হো গয়। কিসসে নফরত করূঁ ? হর বস্তিমে এ্যায়সা হ্যায়। অর ইসসে লেকর হি হমে চলনে পড়তা। কাঞ্চনীসে হমে কুছ্ নফরত নেহী থী ! মগর হমনে মিটিং করকে তয় কিয়া থা কি ওয় পলাশ বাবুকা আনা বন্দ করনা হোগা।

হরি : আমাদের ভয় ক'রত, কারণ ওনার হাতে যত এই পাড়ার ভদ্দর গুণ্ডো। তার ওপর ওনার নজর তো ইদিক উদিক চলতেইছে ! তা আমাদেরও যেমন কপাল—।

হালিম : বীচমে ইয়ে হিন্দু মুসলমান ক্যাসাদ শুরু হো গিয়া—তো হমে বহত দেমাগ ঠিক করনে পড়া। কিঁউ কি—

হরি : তখন যদি হালিম ভাই পলাশবাবুরে ঠ্যাঙাত তো হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বেধে যেতো। কেউ তো আর দেখত না তলিয়ে, কেন কি হচ্ছে।

ডাঃ : তা এই পলাশের নজর কি ঐ কি নাম বললে পারুলের ওপর পড়েছিল ?

খালেক : তাই বাবু। পারুল আমাদের ক'দিন বলেছে কিন্তু— আমাদেরও তো অনেক বুঝে শুনে চলতে হয়। পলাশবাবুর সাথে ঝগড়া কল্লে বস্তি যে জ্বলে যেত বাবু।

ডাঃ : হুঁ !

হালিম : ফিরভি ম্যয় বোলতা হ্যায় ডগ্দর সাব ওয় লড়কী মজবুরী সে ইয়ে কাম কিয়ি হোগী। উসকি দিল অচ্ছি থী।

[এই সময় ২য় ভদ্রলোক ফিরে আসে]

২য় ভদ্র : ওঃ একটা ফোন করতে ঘেমে গেলাম ! পুলিস আসছে ! কি বলছিলে বাবা ? 'কার দিল্ অচ্ছি হ্যায় ?

হরি : ঐ পারুলের কথা হচ্ছে। যিনি খুন করেছে।

২য় ভদ্র : ওঃ খুন করলেও আজকাল অচ্ছি দিল্ থাকছে বুঝি ?

হালিম : মগর ইয়েতো আপ মানেঙ্গে কি পলাশবাবু বহুত জুলুমবাজ থা। অওরৎ কো পিছে পড়তা থা।

২য় ভদ্র : যদি সত্যি এর মধ্যে থেকে না থাকে, তবে আর বেশী বোলনা বাছধনেরা। তাহলে তোমাদেরও নিয়ে হাজতে পুরবে।

খালেক : আমরা কি জানি বলেন ? আমরা তো মিলাদ শরিফ শুনতেছিলাম। গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে আমার খালা ভাবলে পারুলের ঘরে গোঁ গোঁ আওয়াজ কিসের হচ্ছে, তাইতেই—।

হরি : আর আমি তো শুয়েই পড়েছিলাম। গোলমাল শুনে—মানে সকলে যা বলছে আমিও তাই বলছি আরকি। আমরা কি জানি।

ডাঃ : (হঠাৎ যেন একটু উত্তেজিত হ'য়ে) পুলিস কেস যখন হবে তখন তোমরা বলতে পারবে না যে মেয়েটি আসলে ভাল ছিল ? মানে যা তোমরা মনে করতে তাই বলতে পারবে না ? (ভদ্রলোক দুজন অবাক হ'য়ে তাকায়। সবাই চুপ)

হালিম : (ধীরে ধীরে) ওর মুঝে চাচা পুকারতি থী, ম্যয় সচ্ বলুঙ্গা।

২য় ভদ্র : কিন্তু সেতো পাকিস্থানে হাওয়া।

ডাঃ : পুলিসে তো খবরই দিয়েছেন। পাকিস্তানে পালাবার আগে ধরাও তো পড়তে পারে। আর পাকিস্তানে পালাচ্ছে এটাত আপনাদের অনুমান !

১ম ভদ্র : না মশাই—সবাই বলছে। কৈ হে সচ্ বলনেআলা, বলনা।

হালিম : সচ্। পলাশবাবু যব বহুত জুলুম করনে লগা, তো একরোজ ওর বলি থী কি মুঝে ফির ভাগনে পড়েগা চাচা—মগর কঁহা যাঁউ !

থালেক : তা জাঁহাগীর ছেলেডা ভাল ছিল। আর ওর ঘরও আসলে পাকিস্থানে। পারুলেরে ওর মনেও ধরেছিল। আমরা বললাম যে, তোমার যদি নিকে করতে মন যায়, তো কর —তা—।

১ম ভদ্র : দেখেছেন কাণ্ডটা! হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে! ছিঃ ছিঃ এই জন্তেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল! হয় একটা হিন্দু আয়ুবর্থা, তো এই নষ্ট মেয়েগুলোকে গুলি করে মারে।

ডাঃ : পাকিস্তানে নষ্ট মেয়েদের গুলি ক'রে মারা হয়েছে না কি?

১ম ভদ্র : এঁ্যা?

ডাঃ : আর তাছাড়া হিন্দু আয়ুবর্থা যাকে হ'তে হবে, তাকে তো এই পলাশবাবুদের সাহায্যই নিতে হবে! তা এই পলাশবাবুরা কি এই সব নষ্ট মেয়ে মানুষদের মারতে দিতে রাজী হবেন?

২য় ভদ্র : কি জানি মশাই আপনার বাঁকা বাঁকা কথা কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু একটা হিন্দু মেয়ে মুসলমানকে নিকে করছে শুনলেও গায়ের মধ্যে রিরি ক রে ওঠে!

১ম ভদ্র : আর কখন? যখন পাকিস্থানে আমাদের বাপ ভাইকে হত্যা করছে, মা বোনেদের এইরকম অসম্মান করছে ঐ ব্যাটারা! —তখন

ডাঃ : কিন্তু একটা নষ্ট মেয়েছেলের পক্ষে অতটা জ্ঞান থাকা কি সম্ভব?

১ম ভদ্র : তাহলে বলি শুনুন—নাম করব না। কোন এক পাড়ায়, এই রকম এক মেয়েছেলে নিজে আগুনের বল ছুঁড়ে একটা পুরো বস্তি জালিয়ে দিয়েছে, জানেন? গায়ে যার সত্যিকারের হিন্দু রক্ত আছে, সে বেশ্যা হ'লেও সে হিন্দু! হিন্দুর লাঞ্ছনা শুনে তার রক্ত টগবগ করে ফুটবেই! আর সেইখানে—

ডাঃ : পলাশবাবুরা হিন্দুর মেয়েকে লাঞ্ছনা করলে আপনাদের হিন্দুর রক্ত কি বলে ?

২য় ভদ্র : আপনি দেখছি একজন মুসলমান সাপোর্টার।

[ডাক্তার হাসে। হরি সুযোগ পেয়ে বলে]

হরি : বাবু আমাদের কি আর এখানে থাকার দরকার আছে ?

১ম ভদ্র : আছে বৈকি চাঁদেরা !—আছে !! পুলিস আসুক,—অনেক কথাই বেরিয়ে পড়বে আস্তে আস্তে ! আর তোরাই বা কি ? মুসলমানদের সঙ্গে এক বস্তিতে থাকিস !

হরি : জায়গা কোথায় পাব বাবু ?

২য় ভদ্র : তাই ব'লে এই সব পাকিস্থানীদের সঙ্গে !

হালিম : হাম পাকিস্থানী নেহী হ্যায় বাবুজী।

খালেক : বরং আমরা ব'লে দিইচি যে যাদের মন পাকিস্থানে প'ড়ে আছে, তারা সব চলে যাও পাকিস্থানে।

হালিম : হাঁ ইহা গড়বড় মত কর। হাম হিন্দুস্থানী হ্যায় বাবুজী।

১ম ভদ্র : ওঃ, কথা আছে খুব।

২য় ভদ্র : ওইতেই চালাচ্ছে।

[চাকর ঢোকে]

চা : বাবু বড়মা খুব অস্থির হ'য়ে উঠেছেন, আপনাকে একবার ওপরে আসতে বলেছেন।

ডাঃ : বল্ গিয়ে—অস্থির হবার কিছু নেই, আমি একটু পরে আসছি। শোন্, মায়ের খাওয়া হয়েছে তো ?

চা : বলতে পাচ্ছি নে তো।

ডাঃ : বল্ গিয়ে এমন কিছু হয়নি। না খেয়ে থাকলে খেয়ে নিতে বল্।

[চাকর চলে যায়]

ডা: : আপনারাও চলুন বড় বসবার ঘরটায়। থানা থেকে আরও দু'একজন লোক এলে এ ঘরটায় ধরবে বলে মনে হ'চ্ছে না।

১ম ভদ্র : হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুন।

[কথা বলতে বলতে সবাই বেরিয়ে যায়। বারান্দার দিক থেকে শিবানী এসে ঢোকে। ওষুধের আলমারির দিকে তাকায়। পাল্লায় চাবি ঝুলছে। কাঁচের আলমারি। পাল্লা টানে, খুলে যায়। কি যেন খুঁজতে থাকে। পেয়ে যায়। একটা শিশি বার করে, দেখে তাড়াতাড়ি নিজের ব্যাগের মধ্যে রাখে। ডাক্তার আসে। দু জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিবানী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়।]

ডা: : শুনেছো সব নিশ্চয়ই।

শি : (চুপ করে থাকে)

ডা: : কি করবে এখন ?

শি : আমার ওপর আরো ঘেন্না হচ্ছে তো ?

ডা: : না।

শি : যাবার আগে তোমাকে একবার দেখতে বড্ড ইচ্ছে করল যে। বোকা, আমি খুব বোকা।

ডা: : তাহলে টাকা বা ঐ ছেলে নষ্ট করার কথা মিথ্যে ?

শি : না, তাও নয়। আমি আমার ও: এখন আমার সব গোলমাল হ যে যাচ্ছে।

ডা: : সত্যিই তুমি—অন্তঃসত্ত্ব ?

শি : অথচ আমি শান্তিতে মরতে চাইছিলাম! অন্তত: ঐ পলাশের ছেলে—! ও: আমার সমস্ত গা ঘিনঘিন করছে!

ডা: : এইবারে আমার সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে! পলাশের সঙ্গে তাহলে তোমার সম্পর্ক ছিল ?

শি : না, না—। এখন কি কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে ?

ডা: : তুমি বল !

শি : সেই দাঙ্গার সময় ও এসেছিল একদিন। এসেছিল কাঞ্চনীর ঘরে। তারপর এসে পড়ল আমার ঘরে !

ডা: : এসে পড়ল মানে ?

শি : কাঞ্চনী আমাকে ঠকালে আর কি ! প্রথমে নিজে এল—তারপর ও ঢুকে পড়ল।

ডা: : কিন্তু তুমি চেঁচাতে পারতে।

শি : না, পারতাম না। তাহলে হালিমচাচা ছুটে আসত। একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হোত। হিন্দু মুসলমানের আগুন আমাদের পাড়াতেও এসে পৌছত। আরও কত লোক মরত, আরও কত বাড়ি জ্বলে যেত কে জানে ? তাই সে কথা একেবারেই চেপে যেতে হ'ল !

ডা: : আজকে যে কাজ করলে সে কাজ তখন করনি কেন ?

শি : সেও বোধ হয় ঐ একই কারণে। তা ছাড়া তখন ঠিক মনেও হয়নি বোধ হয় ! আর···জীবনে অনেকবারই তো ধর্ষিতা হয়েছি—তাই—কি জানি—মানে সহ্য করলাম !

ডা: : তাহলে আজ একাজ করলে কেন ? সহ্য করলে না কেন ?

শি : পারলাম না ! তবে ও মরে যাবে এটা ভাবিনি !···আচ্ছা ওকি গেছে ? সত্যি ?

ডা: : সত্যি।

শি : যখন আমি বেরোব, তখন ও এল। কোথা থেকে একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে এল ওকে বাধা দেবার ! ওকে কেউ খুন করলে আমি, আমি খুশী হতাম, সত্যি খুশী হতাম, খুব খুসী হতাম, খুব খুশী হতাম (একই ভাবে কথাগুলো বলতে থাকে)

ডাঃ : (ঝাঁকানি দিয়ে) শিবানী !

শিঃ : না, না। কিন্তু আমি ওকে খুন করব ভাবিনি। ওর ছেলেকে খুন করব ভেবে ছিলাম, সে তাকে বাঁচাবার জন্যে, নিজে বাঁচবার জন্যে,—অথবা মরবার জন্যে। কিন্তু ওকে—উঃ—।

ডাঃ : এখন কি করবে ?

শিঃ : মরব। (একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ) তুমি কি আমাকে ধরিয়ে দেবে ?

ডাঃ : তাছাড়া কি করবে তুমি ? এখন আর উপায় কি ?

শিঃ : দোহাই তোমার, আমাকে তুমি এখুনি ওদের হাতে দিও না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি জান না কনেস্টবল থেকে দারোগা পর্যন্ত ওরা সবাই কত নিষ্ঠুর, কত জঘন্য হ'তে পারে। তুমি জান না। [ডাক্তার বিচলিত। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যেই যেন বলে।

ডাঃ : পাকিস্তানে পালাচ্ছিলে সত্যি ?

শিঃ : সত্যি।

ডাঃ : কেন ?

শিঃ : (কান্নার একটা আওয়াজ ঠেলে আসতে চায়) মরব বলে।

ডাঃ : বুঝতে পারলাম না।

শিঃ : সত্যি যে তাই ! এখন আমি কেমন করে বোঝাই ! যদ্দিন বাঁচব ভালভাবে বাঁচব ব'লে তোমাদের পাড়ার এই বস্তিতে এলাম চাচার সঙ্গে ! মাসখানেক কেটে গেল একরকম ভাবে। তারপর শুরু হ'ল।

ডাঃ : কি শুরু হ'ল ?

শিঃ : অনেকেই বুঝে ফেলল যে আমি, আমি খারাপ ছিলাম,—এবং এখনই বা থাকব না কেন ? আর তার সঙ্গে শুরু হ'ল আমার মনের শত্রুতা !

ডাঃ : মনের শত্রুতা ?

শি : বলতেই হবে ?

ডাঃ : বাধা আছে ?

শি : নাঃ এখনও আমার একটু একটু লজ্জা আছে।

ডাঃ : থাক্ তবে।

শি : না। থাকবেই বা কেন! (একটু থেমে) একদিন তোমাকে দেখলাম। দেখলাম আর চিনতে পারলাম! তুমি মস্ত বড় ডাক্তার হয়েছ তা জানতাম। কাগজেও দেখতাম তোমার খবর মাঝে মাঝে। কিন্তু তুমি যে এই পাড়াতেই থাক, তা জানতাম না। জানলে হয়ত—।

ডাঃ : কিন্তু কোথায়, কোথায় দেখলে ?

শি : সেদিন আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। তাই রাস্তার কলে জল আনতে যেতেও দেরি হল। গিয়ে দেখি লম্বা লাইন। তাই লাইনে বালতি বসিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল বলেই এদিক ওদিক তাকাতে হ'ল। বালতির দিকে চেয়ে কে দাঁড়িয়ে থাকবে বল। আর এদিক ওদিক তাকাতে হ'ল বলেই তোমাকে দেখতে হ'ল ···তুমি তোমার গাড়ি করে যাচ্ছিলে।

ডাঃ : তখন দেখতে পেলে ? আশ্চর্য! তোমার চোখের তারিফ করতে হয়! পনের বছর পরে একটা চল্‌তি গাড়ির ভেতর বসা একটা লোককে চিনে ফেললে ?

শি : ঠাট্টা করছ নাকি ?

ডাঃ : (ত্রস্তে) না না, মোটেই না। বরং আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে যে তুমি আমাকে সত্যি ভালবাসতে, তাই এটা সম্ভব হল! কারণ আমারও তো বদল হয়েছে অনেক।

শি : কিন্তু সত্যি কথাটা ত তাও নয়।

ডাঃ : তবে।

শি : খুব ভাল শোনাত হয়ত। আজ যদি আমি খুনীর আসামী না হতাম—তাহলে আমি জল আনতে গেছি—নাইবা হ'ল নদী, নাইবা হ'ল সরোবর, কলকাতার কলই হ'ল না হয়। তবু তো জল আনতে যাওয়া! নাইবা হোল কলসী তবু তো জল আনতে যাওয়া !! অনেক দিনের বিরহের পর তোমার দর্শন পাওয়া আর প্রেমের জোরেই এক নিমেষে তোমাকে চিনতে পারা এবং আমরা ভাল থাকবার সংকল্প একেবারে পাকা হয়ে যাওয়া।···চমৎকার গল্প হ'ত তাহলে, কিন্তু তাতো হয় নি।

ডাঃ : তবে? কি হয়েছিল তবে।

শি : সেদিন সারাদিন একবার মনে হয়, বোধহয় তুমি, আর একবার মনে হয়, নিশ্চয় তুমি! তাই পরদিন আবার দেরিতে—। আচ্ছা তোমার মনে আছে? ধর, আজ থেকে তিন মাস আগে হবে,—এই মোড়ের বস্তির সামনে দিয়ে যখন তোমার গাড়ি যাচ্ছিল, তোমার গাড়ির সামনে হঠাৎ একটা ছোট ছেলে এসে পড়েছিল? অল্প একটু ধাক্কাও লেগেছিল তার, মনে পড়ে?

ডাঃ : হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ে। তারপর?

শি : যারা জল নিচ্ছিল সবাই ছুটে গিয়েছিল। ছেলেটির মাও ছিল সেখানে। তোমাকে গাড়ি থেকে নামতে হ'ল। ড্রাইভারকে বকতে হ'ল, ছেলেটিকে দেখতে হ'ল। বিশেষ কিছু হয়নি ব'লে রায় দিতে হ'ল। তারপর মা আর ছেলের কান্না থামাবার জন্যে দশটা টাকা বার করে দিতে হ'ল তাদের হাতে। পাঁচ থেকে দশ মিনিটের আগে এসব কাজ শেষ হয়নি তোমার। কলকাতার রাস্তা তো! আর তাই,—আর তাই তোমাকে ভাল ক'রে দেখা সম্ভব হ'ল। কারণ খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম কিনা।

ডা: : তুমি ছিলে সেইখানে ?

শি : হ্যাঁ সেই ছেলেটার মায়ের পাশেই।

ডা: : কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনতে পারিনি।

শি : তুমি তো তাকাওনি কারুর দিকে। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলে তুমি। আর তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলে। তোমার আমার মাঝখানে এক গজেরও ব্যবধান ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেখানে একজন কেউ তো তোমার কাছে কেউ না। সেখানে সবাই যে তোমার কাছে বস্তির লোক।

ডা: : কিন্তু আমি সেভাবে মানুষকে দেখি না।

শি : যাই হোক, সেই হ'ল আমার কাল। তোমাকে মনে ছিল— তোমার সেই চেহারা, যখন তোমার বয়স পঁচিশ। আবার তোমাকে দেখলাম, তোমার গলা শুনলাম। আবার আমার মনে হ'ল, না এ লোকটা তো দূরের লোক নয় !! তার পরদিন আবার সেই সময় জল আনতে গেলাম। (হঠাৎ থেমে) তারপর রোজ ঐ সময়েই জল আনতে যেতাম আর কি !

ডা: : ওঃ !

শি : আর তাই তো আমার সব ওলটপালট হ'য়ে গেল। নইলে পলাশকে সহ্য করা এমন কি শক্ত ছিল ! নইলে এই বস্তিতে থাকাই বা এমন কি শক্ত ছিল ! গোড়ার দিকে মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রে হেরেছিলাম। এবার হারতে পারলাম না কেন ?

ডা: : শিবানী একটা কথা তবু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। ভুল বুঝ না, কারণ তোমাকে বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। সে আমি চাইও না।

শি : অমন ক'রে বোল না। অমন ক'রে বললে আমার সঙ্কোচ হয়। তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে, কর। আমি বলব।

ডা: : মানে তোমার মনের শত্রুতা ব'লে তুমি যা বললে—মানে—তুমি

তো আর একজনকে বিয়ে ক'রে তার সঙ্গে ঘর করতে চলেছিলে!

শি : হ্যাঁ চলেছিলাম! ঘর করতে? হ্যাঁ তাও হয়ত করতাম কিছুদিন। ছেলেটা খুব খারাপ ছিল না। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিল। ওকে ঠকাতে হবে বলে মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগত। কিন্তু কি করব, আমার লক্ষ্যে আমাকে যদি পৌঁছতে হয়—। তাছাড়া আমাকেই কি কম লোক ঠকিয়েছে!

ডাঃ : তোমার লক্ষ্যে? কি লক্ষ্য ছিল তোমার?

শি : জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া।

ডাঃ : জন্মভূমি?

শি : তুমি তো জান আমাদের দেশ ছিল পাকিস্তানে!

ডাঃ : ও:, হ্যাঁ।

শি : জীবনের সব জায়গায় যখন আমি হেরে গেলাম, বেঁচে থাকাটা যখন আমার কাছে অর্থহীন সময় কাটান বলে মনে হ'তে লাগল, তখন কেবলই আমার সেই ছোট্ট গাঁয়ের, আর সেই গাঁয়ের মধ্যে আমাদের সেই ছোট্ট বাড়িটার কথা মনে পড়তে লাগল। যতগুলো গাছ ছিল আমাদের বাড়িতে, সব মনে পড়তে লাগল। নিম, পেয়ারা, সজনে! বড্ড দেখতে ইচ্ছে করল সবাইকে—মনে হ'ল ওদের যেন প্রাণ আছে, আমি গেলে যেন ওরা চিনতে পারবে।

ডাঃ : সবই তোমার কল্পনা শিবানী—রোমান্টিক চিন্তা। দেহে মনে তুমি অসুস্থ।

শি : তাই হবে বোধ হয়। তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবে না। —কারণ যারা জীবনে জিতে গেছে, তারা হারার দলের কথা বুঝতে পারে না বোধ হয়।

ডাঃ : কিন্তু সেখানে তুমি যেতে কি করে? এই ছেলেটা তোমাকে ছেড়ে দিত?

শিঃ আমি যেতাম। আমাকে কেউ ঠেকাতে পারত না। তাছাড়া জাহাঙ্গীর আমাকে সত্যি একটু ভালবাসে বোধহয়, তাই ওকে ঠকান কঠিন হ'ত না।

ডাঃ: সে ভালবাসে ব'লে তাকে ঠকাবে? তুমি কি ধরনের লোক?

শিঃ তুমি কোন্ রাজ্যে বাস কর? একাজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তো মানুষ হামেশাই করে থাকে। খোঁজ নিয়ে দেখ, হয়তো তোমার নিজের জীবনের ব্যবহারই তোমাকে ব'লে দেবে। তাছাড়া আমি তো তার কোন ক্ষতি করছি না। আমি যাব। তারপর তাকে ছেড়ে আমার জন্মভূমিতে যাব। মরব বলে যাব। একটু শান্তিতে মরব বলে যাব।

ডাঃ: মরবে ঠিক করেছিলে?···মরবে বলেই যদি ঠিক ক'রে থাক তাহলে এখানে মরলে না কেন?

শিঃ সেখানে গিয়ে মরতে আমার ভাল লাগবে বলে। তাছাড়া একটা গর্তের দরকার ছিল আমার, যেখানে আমাকে মরবার আগে কেউ ইঁদুরের মতন খোঁচাবে না। ত্মাখো, আমার যা ভাল লাগে সারা জীবনে আমি তা করতে পারিনি। তাই মরবার মুহূর্তটাকে ভাল লাগাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাও বোধহয় হবে না, না?

ডাঃ: না, হবে না বোধ হয়!

শিঃ তুমি আমাকে ওদের হাতেই দেবে?

ডাঃ: (একটু চুপ) তাছাড়া কি করব আমি?

শিঃ (অত্যন্ত আগ্রহে) আমাকে ছেড়ে দাও। আজ রাত্রের মধ্যে আমার বর্ডার পার হয়ে যাবার কথা। তারপর তো আমি সাবিরা বেগম। তোমাদের সমাজের আর কোন ক্ষতি তো আমি করতে আসব না। তাহলে তুমি কেন আমাকে যেতে দেবে না?

ডাঃ: ঠিক। কিন্তু আমি সামাজিক লোক। এতটা জানতে পেরেও আমি—

শি : মনে করো না এটা একটা দুঃস্বপ্ন! আমি তোমার কাছে আসিনি! কিছু বলিনি! তুমি কিছু জান না!

ডাঃ : (প্রচণ্ড যন্ত্রণায় যেন) পাশের ঘরের মৃতদেহটা যে দুঃস্বপ্নের চেয়েও বেশী !!

[শিবানী চাপা আর্তনাদ করে ওঠে]

ডাঃ : সত্যি তুমি যদি না আসতে শিবানী!

শি : ভগবানও যে আমার শত্রু হ'য়ে যাবে কি ক'রে জানব বল! ভেবেছিলাম আমার শেষ মুহূর্তে আমি জিতব! কিন্তু—। ওঃ। ও যদি তখন না আসত।

[বাইরের দরজায় টোকা। ডাক্তার, শিবানী দুজনেই উৎকর্ণ, ভীত]

ডাঃ : কে? কি দরকার?

চাকরের গলা : আপনাকে—একবার ডাকছেন ওঁরা।

ডাঃ : কারা?…কেন?

চা : দারোগাবাবু এসেছেন!

ডাঃ : এখুনি আসছি বল।…তুমিই বল শিবানী, এবার কি করব।

শি : তোমার ভগবানকে তুমি জিজ্ঞাসা কর!

ডাঃ : সমস্ত জেনে আমি কি করে বলব যে— …তার চেয়ে শিবানী আমি একটা কথা বলি—তুমি ধরা দাও, আমি চেষ্টা করব যাতে তোমার সাজা না হয়। কলকাতার সবচেয়ে নামকরা ব্যারিস্টারের সাহায্য নেব আমি।

শি : ব্যারিস্টার আমাকে বাঁচাতে পারবে?

ডাঃ : পারবে। তুমি তো ইচ্ছে ক'রে একাজ করনি। ও যদি তোমার ওপর জোর করবার চেষ্টা না করত—তাহলে ত—।

শি : বেশ্যার ওপর বলাৎকারের কেস্ হয় কি ? ওদেরও তো ব্যারিস্টার থাকবে !

ডাঃ : কিন্তু তোমাকে তো কেউ দেখেনি খুন করতে—!

শি : ওঃ। তুমি বলছ যে তোমার সত্যের খাতিরে এখন আমাকে ধরা দিতে হবে। তারপর তোমার ব্যারিস্টার মিথ্যা বলে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে ? দেখেছ, তুমি নিজেই জান না সত্য কি ? হয়তো তোমার মত কোন "সামাজিক" লোকই জানে না। তাই তো এই সমাজ সংসারের ওপর আমার এত ঘেন্না হ'য়ে গেছে !···ঠিক আছে, তোমার যা কর্তব্য ব'লে মনে হয় তুমি তাই কর। আজ হঠাৎ এসে আমি তোমার কর্তব্যে বাধা দেব না।

ডাঃ : আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করব। তুমি অপেক্ষা কর, কারণ এখন তুমি যেতেও পারবে না, গেটের সামনে ভীষণ ভিড়। (চলে যেতে চায়। অবার ফিরে এসে বলে) কেউ যদি এঘরে আসে, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কি বলবে ?

শি : কি বলব ?

ডাঃ : বোল যে—বোল তুমি আমার আত্মীয়া রোগী—নাম—শিবানী—হ্যাঁ শিবানী।

[বেরিয়ে যায়। শিবানী দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। ফিরে আসে চেয়ারটার কাছে। ব্যাগটা হাতে নেয়। শিশিটা বার করে চারিদিকে তাকায়। জলের জন্তে কি ? তাকিয়ে থাকে শিশির দিকে। তারপর শিশিটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয়। হঠাৎ ব'সে প'ড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ভেতরের দিকের দরজায় বিধবা প্রায়-বৃদ্ধা এক মহিলাকে দেখা যায়। ডাক্তারের মা। পোশাকে বড়োলোকের ছাপ আছে। ছেলের দেরি দেখে নীচে নেমে এসেছেন]

মা : অমু, কি হ'য়েছে। এসব কি শুনছি !

(হঠাৎ থেমে যান। শিবানী নিজের আবেগে কেঁদে চলেছে, একথা শুনতে পায়না বোধহয়)

একি! তুমি কে? কি হয়েছে তোমার?

[এইবার শিবানী শুনতে পায়। সোজা হ'য়ে বসে। কিন্তু যেদিক থেকে প্রশ্ন আসে সেদিকে তাকাতে পারেনা। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে]

শি: (না তাকিয়ে) আমি ডাক্তারবাবুর একজন আত্মীয়া, আমার অসুখ করেছে। তাই এসেছি।

মা: আত্মীয়া! কি নাম তোমার?

শি: আমার নাম শিবানী।

মা: শিবানী—মানে—শিবানী?

[শিবানী এইবার ফিরে তাকায়। একটু স্তব্ধতা। তারপর দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে]

মা: তুমি!

শি: আপনি!

মা: (কষ্টে এগিয়ে আসতে থাকেন) তুমি এতদিন পরে এখানে কি মনে করে এসেছ?

শি: আমি অসুস্থ।

মা: (গভীর সন্দেহে) অসুস্থ তুমি হ'তে পার। কিন্তু কিজন্য এসেছ তুমি। কতক্ষণ এসেছ?

শি: অনেকক্ষণ।

মা: অমু কোথায়?

শি: ওদিকে কোথায় গেছেন।···অনেক লোক এসেছে, তারা ডাকছিল।

মা: হুঁ! তা এত লোকজন কেন? কে খুন হয়েছে?

শি: এঁ্যা?

মা : তুমি জাননা কিছু ?

শি : না।

মা : অনেকক্ষণ তো এসেছ তুমি, জাননা কিরকম ?

শি : (ভয়ে) হ্যাঁ, আমিও ঐরকম কি শুনছিলাম।

মা : অত ভয় পাচ্ছ কেন ? যেন খুনটা তুমিই করেছ !

শি : কি বলছেন এসব !

মা : বলছি, অত ভয়-পাওয়া ভাব দেখাচ্ছ কেন ? খুন জখম তো কলকাতায় লেগেই আছে ! আর তোমার বয়সও তো নেহাত কম হ'ল না ! (একটু চুপ) তা হঠাৎ এতদিন পরে কি মনে করে এসেছ ?

শি : এমনি দেখা করতে ! আর তাছাড়া অসুখ করেছে।

মা : কি অসুখ ?

শি : সে অন্যরকম !

মা : তা দেখাই যদি করতে এসে থাক তা আমার সাথে দেখা করতে গেলেনা কেন ? বুঝেছি !! বৌমার সংবাদ পেয়েই তুমি এসেছ ! তুমি কেমন মেয়েছেলে ? তিনমাসও হয়নি বৌমা গত হয়েছে। তা তোমার একটু তর সইল না ?

শিঃ এসব কি বলছেন ?—আমি—

মা : তোমার কান্নার ঘটা দেখেই আমি বুঝেছি ! ছিঃ !

শি : আপনি ভুল—

মা : কলকাতায় তো অনেকদিনই আছ, অসুখও তোমার আজ হয়নি ! বৌমাও গেল, আর তুমিও ডাক্তার পেলেনা অসুখ সারাবার !

শি : আপনার বৌমা মারা গেছেন, আমি জানতাম না।

মা : নাঃ জানতে না। দেখ, আমিও মেয়েছেলে। তোমার ঐ কান্নাকাটি দেখে ব্যাটাছেলের মন ভুলতে পারে—কিন্তু আমাকে অত সহজে তুমি ভোলাতে পারবে না !

[অপমানে শিবানীর চোখ জ্বালা করে ওঠে]

শি: কিন্তু আমি তো আপনার ধরনের মেয়েছেলে নই, আপনি আমাকে বুঝবেন কি করে ?

মা: কি বললে ? মানেটা শুনি !

শি: মানে ? মানে—আমি নিজে মেয়েছেলে হ'লেও মেয়েছেলের কান্নায় আমার মন ভোলে—তাইনা আপনার বৌমাকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে কাঁদতে, তাই না নিজে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ? আর আমি ভুলে গিয়েছিলুম ! তাই আমি কেন এসেছি তা বোঝবার সাধ্য—

মা: তোমার আস্পদ্দা তো কম নয় ! তোমার কোন খবর আমি জানি না মনে করেছ ! দিনকতক আগে দেখা হয়েছিলো তোমার ছোট বোনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ! সব কথাই শুনলাম। লজ্জায় তোমার জন্য তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারে না। বাধ্য হয়েই তাদের বলতে হয় যে, তাদের বড় বোন মারা গেছে। তুমি মনে করেছ এসব কথা আমি অমুকে বলব না !

শি: দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত আলোচনা করেছেন আপনারা ! মা কালী নিশ্চয়ই পুণ্যের ঘরে আপনাদের নম্বর বাড়িয়ে দেবেন !

মা: দেখ ! তুমি ভাবছ আমার ছেলেকে তুমি হাত করতে পারবে ? দারোয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে এখুনি তোমাকে বার করে দিতে পারি জান ?

শি: [প্রথমে একটু চুপ করে থাকে, তারপর হঠাৎ যেন মাথায় একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি আসে। হেসে বলে]
অমন কাজও করবেন না যেন ! জানেন তো আমি খারাপ মেয়েছেলে ! শেষ কালে যা-তা ব'লে চেঁচাব ! হয়তো বলে ফেলব,

যে বৌ মারা যাবার পর আপনার ছেলে আমাকে ডেকে এনেছে ! সেটা কি রকম দেখাবে না ?

মা : (থতমত খেয়ে যায়) কেন এসেছ ? আমাকে নিয়ে খেলা করতে এসেছ ?

শি : করলে মন্দ হয় না। পনের বছর আগে একটা দাবার চাল দিয়ে আপনি জিতে গিয়েছিলেন। আজ হয়ত আমি জিতব। কে বলতে পারে ?

মা : তুমি কি সেইসব কথা বলতে এসেছ অমুর কাছে ?

শি : হুঁ, হুঁ। কেন এসেছি—আপনি হলেন গিয়ে গুরুস্থানীয়া—বলতে গেলে আমার শাশুড়ীস্থানীয়া—আপনার কি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ? আমার কিন্তু লজ্জা করবে বলতে। শুনবেন ?

মা : থাক ! শয়তানী কোথাকার ! তবে আমার ছেলেকে আমি জানি ! সে কখনো—দেশজোড়া তার নাম। তুমি কি তার সেই সুনাম নষ্ট করে দিতে চাও ?

শি : পাগল, না মাথাখারাপ ! (অত্যন্ত ভালমানুষের মত) আমি চাইব যে আমার স্বামীর সুনাম আরও বাড়ুক। শুধু দেশে কেন বিদেশেও যাতে—

মা : এতদূর পর্যন্ত তোমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে নাকি ? না, না, শোন শিবানী, তুমি কি মনে করছ, এটা তুমি ভাল কাজ করছ ? তাহলে আমার অমল আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে ?

শি : এবার তো আপনার বৌমা নেই, কান্নাকাটি করে মন ভোলাবার কাজটা সম্পূর্ণ আপনি একাই করবেন নাকি ?

মা : ইতর ! ছোটলোক কোথাকার ! (রাগে প্রায় পাগল) এখুনি তোমাকে আমি বাড়ি থেকে বার করছি বলব তুমি চুরি করতে এসেছিলে ! পুলিশও তো বাড়িতেই আছে বোধহয়। দেখি অমু তোমাকে কেমন বাঁচায় !

(শিবানী একটু ভয় পায় যেন)

শি : হঠাৎ ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন ? আস্তে কথা বলুন। আপনার চীৎকারে বাইরের লোক কেউ যদি এখানে এসে পড়ে, তাহলে আপনার ছেলে সত্যিই আর কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না !!

মা : কত টাকা চাস তুই ? টাকা দিচ্ছি বেরিয়ে যা এখান থেকে।

শি : আপনি আবার ভুল করছেন, আমি আপনার মত স্ত্রীলোক নই !

মা : কি বললি ?

শি : টাকার জন্মেই কি আপনি আপনার ছেলেকে বড়লোকের মেয়ের কাছে বিক্রি করেন নি ? আর টাকা ছেড়ে দিয়েই কি আমি চলে যাইনি ?

মা : আমাকে অপমান করতেই কি তুই এসেছিস আজকে। তুই পারতিস দিতে এই ঐশ্বর্য এই নাম ? এইসব তুই পারতিস দিতে অমলকে ? পারতিস ?

শি : কিন্তু আমি যা পারতাম তা ও পায়নি, আমি জানি তা ও পায়নি—। (একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে বলে) তাহলে আজ আমি আসা মাত্র ও ওরকম করত না, ও পায়নি, ও কিছু পায়নি। আমাদের সমস্ত কল্পনা (হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে) কেন কেন সেদিন আপনি সমস্ত নষ্ট করে দিলেন ?

মা : ওকি ! অমন করে আমার দিকে এগিয়ে আসছ কেন ?—দাঁড়াও। (শিবানী দাঁড়ায়। মা একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসবার চেষ্টা করে) একি ! আমাকে কি তুমি খুন করবে নাকি ? (শিবানী যে ঘরে মৃতদেহটা আছে সেদিকে তাকায়) তোমার গায়ে এত শক্তি নেই যে তুমি আমাকে খুন করতে পার !

শি : এঁ্যা ? (অপ্রকৃতিস্থভাবে) খুন করতে কি গায়ের জোর লাগে নাকি ? ইচ্ছেটা চাই, ইচ্ছে থাকলে—। ওকে কেউ খুন করুক এই ইচ্ছেটা আমার ছিল—

মা : (গভীর সন্দেহে) এ কিরকম করে কথা বলছ তুমি ?

[বাইরে আবার অনেক লোকের পদশব্দ আর কথার আওয়াজ— ডাক্তারের গলা 'এই ঘরে আসুন' গুঞ্জন। ভারী বুটের আওয়াজ।]

মা : (হঠাৎ যেন আশ্বাস পায়) ঐত ঐত ওরা—অমু— (বলে ডাকতে যায়। মাতালের নেশা কেটে যাওয়ার মত হঠাৎ শিবানী সচেতন হয়)

শি : (চাপা গলায়) কথা বলবেন না এখন !

মা : কেন ? এসব তুমি—[আবার চীৎকার করে কাউকে ডাকতে যায়। মুহূর্তের মধ্যে শিবানী যেন লাফিয়েই মায়ের কাছে চলে আসে। হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে প্রাণপণে। পেছনের ঘরে কথার আওয়াজ হ'য়েই চলে]

শি : (চাপা গলায়) বলছি ন বারে বারে, কাউকে ডাকবেন না ! আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন ! ওঘরে যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনও যদি আমাকে চিনতে পারে, তাহলে আপনার ছেলের সম্মান তো নষ্ট হবেই, এমন কি হাতেও দড়ি পড়তে পারে। কারণ আমি খুনের আসামী, পালিয়ে এসেছি ! ওরা যদি এখানে আমাকে দেখে তাহলে ধরেই নেবে যে ডাক্তার আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল ! কারণ ও এখনও ওদের কাছে আমার নাম বলেনি ! আপনার ছেলেকে যদি ভাল লোক বলে জানেন, তাহলে এটাও জেনে রাখুন যে ভাল লোকের শত্রুও অনেক থাকে। তারা এ সুযোগ ছেড়ে দেবে না !···চেঁচাবেন না তো ? বেশ ! (ছেড়ে দেয়। মা আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে থাকে শিবানীর দিকে।) আমার জন্যে আর আমার—(হঠাৎ থেমে যায়)

মা : (যে মহিলাকে এতক্ষণ শুভ্র থান পরিহিতা বড়লোকের বাড়ির দাম্ভিক মহিলা বলে মনে হচ্ছিল, কোথায় তার অহঙ্কার চলে গেছে। নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, মাথার কাপড় পড়ে গেছে,—নির্বিষ সাপের অবস্থা যেন) তুমি কি সত্যি ঐ কাজ করেছ ?

শি : করেছি !

[পেছনের ঘর থেকে লোক চলে যাবার আওয়াজ নিস্তব্ধতা।]

মা : কেন ?

শি : (হঠাৎ ক্ষেপে যায়) আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কোন কথা ! (তারপর হঠাৎ ঘুরে বলে) আপনার জন্তে। আপনার জন্তে আজ আমি একটা বেশ্যা, একটা খুনী—একটা—আপনাকে যদি আমি —[কোণে টিপয়ের ওপর অযত্নে রাখা একটা পেতলের মূর্তি ছিল। তুলে নেয় সেটা, যেন ছুঁড়ে মারবে, সত্যি যেন খুন করবার ইচ্ছে হয়েছে শিবানীর]

মা : (অক্ষম আর্তনাদ করে ওঠে) শিবানী !

শি : (সম্বিত ফিরে পায়। নামিয়ে রাখে মূর্তিটা) আমার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইবেন না আপনি !

মা : আমি তো মা চাইনি।

[শিবানী তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। একটু হাসি আসে যেন ঠোঁটে। পরক্ষণেই যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে যায়। নিজের মাথাটা চেপে ধরে]

শি : আপনি চলে যান আমার সামনে থেকে—না হলে আমার মাথাটা বোধহয় সত্যি খারাপ হয়ে যাবে ! (হঠাৎ কেঁদে ফেলে।)

[ভেজান দরজা খুলে ডাক্তার ঢোকে। অবাক হয়]

ডাঃ : একি কাণ্ড ! মা তুমি কি করে নীচে—

[ডাক্তারের কথা শেষ হয় না, মা এতক্ষণ যেন কিরকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারকে দেখে যেমন জলে ডুবে যাওয়া লোক একটা কুটো আঁকড়াতে চায়, তেমনি করে ডাক্তারের দিকে হাত বাড়ায়]

মা : অমু—। (কেঁদে ফেলে)

ডাঃ : কি ব্যাপার ! আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ! মা তুমি নড়তে পার না বাতের ব্যথায়, তুমি কি করে—।

মা : অমু—বাবা পুলিশে দে ওকে, পুলিশে দে—।

ডাঃ : চুপ কর ! কি বলছ তুমি !

মা : এতক্ষণ তো ও আমাকে চুপ করিয়েই রেখেছিল বাবা। ভয়ে আমি আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম—।

(শিবানী হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়)

শি : সবাই চলে গেছে ?

ডাঃ : হ্যাঁ।

শি : তাহলে এবারে আমি যেতে পারি ?

ডাঃ : তুমি যাবে ? এখনও একটু ভিড়—

মা : অমু ওকে পুলিশে দে—ওকে—

ডাঃ : আঃ মা, দয়া করে একটু চুপ কর !

মা : চুপ আমি করছি ! কিন্তু আমাকে পর্যন্ত ও খুন করতে এসেছিল। বল, এবার আমাকে চুপ করে থাকতে বল।

ডাঃ : সেকি ! শিবানী ?

[পাশের ঘরের ঘড়িতে আওয়াজ হতে শুরু করে। শিবানী উৎকর্ণ হয়। ডাক্তারও। মা একটা কথা বলতে যায়, কিন্তু থেমে যায়]

শি : এগারটা, যাঃ।

ডাঃ : কি যাঃ ?

শি : (প্রচণ্ড হতাশায়) জাহাজীর চলে গেল !

মা : পুলিশে দে ওকে অমু—ওকে—

শি : কেন ?

মা : ন্যাকা ? কেন ? নিজে মুখেই তো স্বীকার করলে !

ডাঃ : কি, কি স্বীকার করলে ?

মা : যে ও খুন করেছে।

ডাঃ : (শিবানীকে) তুমি বলেছ একথা ? কেন মিথ্যা কথা বলতে গেলে ?

মা: তার মানে?

ডাঃ: ও কেন খুন করতে যাবে মা, ও খুন করেনি।

মা: একী হেঁয়ালী হচ্ছে তোমাদের!

ডাঃ: খুন যেখানে হয়েছে সেখানে শিবানী কোনদিন ছিল না ত'। পারুল বলে একটা মেয়ে খুন করেছিল—তাও সঠিক কেউ জানে না! আর সে তো পাকিস্তানে চলে গেছে জাহাঙ্গীর বলে একটা ছেলের সঙ্গে। তার সাথে—

মা: দাঁড়া অমু—এক্ষুণি ও বললে না, যে—জাহাঙ্গীর চলে গেল! কেন, কেন বললো ও, ওকথা? কেন?

ডাঃ: মা, আমি যা বলছি তাই শোন! শিবানী আমাদের আত্মীয়া, অনেকদিন পর দেখা করতে এসেছে, অনেক দূর থেকে। তার সঙ্গে আজকের ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক কেবল এইটুকুই যে—আমি ডাক্তার, তাই একটা লোককে মৃত বলে ঘোষণা করতে হয়েছে—আর সেই সময় শিবানী এখানে এসে পড়েছিল। আমাকে এরকম ডেথ সার্টিফিকেট তো কত লোককে দিতে হয়। তার সঙ্গে তোমার তো কোন সম্পর্ক নেই মা! তোমার জানবার তো দরকার নেই!

মা: আমার জানবার দরকার কতটুকু শুনি!

ডাঃ: মা, শিবানী অনেকদূর থেকে এসেছে। ওকে ওপরে নিয়ে যাও। ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

মা: ও এখানে থাকবে? অমু—! ওর সব পরিচয় তুই জানিস?

ডাঃ: আজকে এই এত রাতে ও কোথায় যাবে?

মা: থানায়। হাজতে।

ডাঃ: না মা।

মা: অমু!!

ডাঃ: যা বলছি তাই কর মা।

মা : তুই আজ আমাকে হুকুম করছিস অমু ?

ডাঃ : আজকের সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম !

মা : অসম্ভব ! তুই, অমু তুই এতবড় অন্যায় হ'তে দিবি ?

ডাঃ : অন্যায় ?

মা : ওকে আজ যদি তুই পুলিশের হাতে না দিস, সেটা বেআইনী হবে না ?

ডাঃ : কিন্তু মা, বে-আইনী আর অন্যায় দুটো এক কথা নয়। কিন্তু যাক, অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে। তুমি ওপরে যাও মা।

মা : বে-আইনী মানেই অন্যায় ! এই সেদিনও তুই এই কথাই বলেছিস অমু !

ডাঃ : তাই-ই সেটাও ঠিকই বলেছিলাম। আমি বিশ্বাসও করি তাই ! কিন্তু আজকের ব্যাপারটাই অন্যরকম।

মা : অন্যায় সব সময়েই অন্যায় ! আজ খুন করল বলে অন্যায় হ'ল না, আর কাল খুন করলেই অন্যায় হবে, এ কি ধরনের কথা !

ডাঃ : কে খুন করেছে মা ? আমি তোমাকে বার বার বলছি মা, যে— যে খুনটা হ'য়েছে তার সঙ্গে আমাদের শিবানীর কোন সম্পর্ক নেই !

মা : আমি কিছু বুঝতে পারছি না অমু ! এ কাজ যদি তুই করিস, তাহলে মানুষের ন্যায় অন্যায় নিয়ে আর কোন দিন তুই কথা বলতে পারবি না !

ডাঃ : যত সহজে বলতাম, তত সহজে আর বলতে পারব না সত্যি।

মা : একটা মেয়ে মানুষের মোহে প'ড়ে তুই— ! ছিঃ ছিঃ ! বৌমা চলে গেল, আমি কি এই দেখতে প'ড়ে রইলুম !

ডাঃ : মা !!

মা : না, একাজ তুই করতে পারবি না।

ডাঃ : তবে তুমি আমাকে কি করতে বল ?

মা : ওকে পুলিশে দে—, না হয় এখুনি ওকে বাড়ি থেকে বার ক'রে দে।

[শিবানী এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে এদের দিকে তাকিয়েই কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবছিল। এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়]

শি: (উদ্‌ভ্রান্তের মত) আমি যাব।—কিন্তু কোথায় ?

ডাঃ: কাল সকালে তোমার যাবার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। তোমাকে ইঁদুরের মত খুঁচিয়ে যাতে না মারতে পারে, অন্ততঃ সেটুকু আমাকে করতেই হবে। আমাদের পাপের একটা আংশিক প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও !

মা: পাপ ? কিসের পাপ ?

ডাঃ: ওকে আমরা সবাই মিলে ঠকিয়েছি মা।

মা: কখনো না। যে নিজে ভাল থাকতে চায়, তার এ অবস্থা হ'তেই পারে না। তুই ওর সম্পর্কে সব কথা জানিস না বোধ হয় অমু—।

ডাঃ: তোমার সম্পর্কেও তো আমি অনেক কথা জানি না মা ! আর আজকে জেনেও তোমাকে তো আমি—।

মা: কি, কি জানিস তুই !

ডাঃ: থাক্ মা। আমি খুব ক্লান্ত ! কাল সব চেয়ে ভোরে কোন্ প্লেন কোথায় যায়, তারই খোঁজ করতে হবে। আমি একটু ফোন ক'রে আসছি। (বেরিয়ে যায়)

[আবার দুইজন স্ত্রীলোক মুখোমুখী। মা'র চোখে যেন বিষ ঝ'রে পড়ছে।]

মা: কি বলেছ তুমি আমার নামে ? এর শোধ আমি—। চাকরগুলো গেল কোথায় সব।

শি: কেন ! কি দরকার ?

মা: তোমার সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করতে হবে—।

শি: কি ব্যবস্থা ?

মা: (সে কথার উত্তর না দিয়ে) সত্যি, কি দিয়ে ওকে তুক করলে

বলত ? এ যেন আমার ছেলে নয় বলে মনে হচ্ছে ! এমন ছেলে—।

[বাইরে একটা গাড়ীর শব্দ। গাড়ী থামল। সেই চাকরটি ছুটে আসে]

চা : বাবু—

মা : কি হ'য়েছে ?

চা : পুলিশ লাশ নিতে এসেছে। বাড়ির লোকও আছে অনেক।

মা : পুলিশ এসেছে ? শোন, দারোগা—না কে এসেছে ?—মোটকথা আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেতে বলবি !

চা : (অবাক) আপনার সঙ্গে ?

মা : (রাগে) হ্যাঁ হ্যাঁ ! আর অমুকে একথা বলবি না ! যা অমুকে গিয়ে বল্, যা বলতে এসেছিল ! টেলিফোন করছে অমু।—

চা : আচ্ছা। (চলে যেতে চায়)

মা : পুলিশকে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে বলবি ! (চাকর বেরিয়ে যায়)

শি : (ভয়ে এবং ঘৃণায়) আপনি কি আমাকে ধরিয়ে দেবেন ?—কিন্তু কেন ? আপনার ছেলেরই বা কি হবে তাহলে ?

মা : দশ বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হ'য়েছিলাম। এই এতবছর ধরে তার ভালমন্দ আমিই ভেবেছি। আজও আমিই ভাবব।

শি : দোহাই আপনার, একাজ আপনি করবেন না ! একদিন তো আমি আপনার উপকার করেছিলাম, অন্ততঃ সেই কথা ভেবে—।

মা : আমার ভাবা হ'য়ে গেছে ! আজ এই বে-আইনী কাজ ওকে যদি আমি করতে দিই, তাহলে জীবনে আর কোন দন ও শান্তি পাবে ? এটা তো ঝোঁকের মাথায় করছে, তুকের গুণে করছে ! বুঝতে ও পারবেই একদিন।

শি : (চোখ তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে) কিন্তু আমি যদি বলি অমল আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তাহলে ?

মা : ডেকে যখন সে সত্যি পাঠায়নি, তখন ওকথা কেউ বিশ্বাস করবে না! এবং অমুও সেকথা বলবে না।

শি : কিন্তু এক সময়ে তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল—তাই আজকে ডেকে পাঠানটা অস্বাভাবিক নাও হ'তে পারে তো?

মা : (হেসে) অমু এতখানি নির্লজ্জ হ'তে পারে না যে তার ভালবাসার কথা পুলিশকে বলতে বসবে! তোমাকে এখান থেকে পুলিশে নিয়ে গেলেই তার মাথা ঠিক হবে! তার ছেলের কথাটাও তো তাকে ভাবতে হবে!

শি : কিন্তু আমি তো নির্লজ্জ হ'তে পারি। আপনার নাতির কথা ভেবে আমি তো চুপ করে নাও থাকতে পারি!

মা : সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আর যাতে না করে সে ব্যবস্থাও করা যাবে!

শি : বিশ্বাস করবে। তার চিঠিগুলো যে এখনো আছে আমার কাছে। নতুন ডাক্তার হ'তে যাচ্ছে, ইচ্ছে করে ডাঃ চৌধুরী বলে কত চিঠিই তো লিখেছিল আমার কাছে। যদি আমি সেগুলো দেখাই, তবু বিশ্বাস করবে না কেউ?

[একটু চুপ]

মা : তুমি এতদিন সেই চিঠি রেখে দিয়েছ আমাকে প্যাঁচে ফেলবার জন্যে?

শি : তা ছাড়া, আপনার লেখা চিঠিটাও আছে আমার কাছে।

মা : এঁ্যা! সে চিঠি তো তোমার নষ্ট ক'রে ফেলবার কথা ছিল।

শি : (একটু হাসে) আপনি জানেন যে আপনার অনেক কথাই তখন আমি মানতাম। বলতে লজ্জা নেই, যে একটা সম্পর্ক হবে বলেই মানতাম। চিঠি দিয়ে আপনি যখন সেটা ভেঙে দিতে চাইলেন, তখন আপনার হুকুমটা মানবার দরকার আর মনে হ'ল না! তাই ওটা রয়েই গেল!

মা : (প্রায় হিসহিস করে) ভাবলে, যে কোনদিন ওটা দিয়ে আমাকে জব্দ করতে পারবে!

শি : (ঘৃণায় একটু চুপ করে থাকে) আমার জীবন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাবার কারণের দলিলটাকে নষ্ট করতে মায়া হ'তে লাগল। আজ সকালের আগে ওগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখিনি কতদিন। আজ সকালে দেখলাম কালি দিয়ে লেখা চিঠি পত্রের বিশ বছর পরেও মোটেই নষ্ট হ'য়ে যায় নাত!

মা : উঃ! তখন তোমাকে কতই না ভাল আর মিষ্টি আর সৎ বলে মনে হতো। তুমি এত ভেবেচিন্তে কাজ করতে পার, তখন আমার তা মনে হয়নি!

শি : আমি ভাল,—যাই কেন না করে থাকি আমি, আমি এখনও সৎ।

মা : লজ্জা করে না তোমার! সৎ! তাই আমাকে এই প্যাচে ফেলেছ!

শি : আমার জীবন আমাকে একটা শিক্ষা দিয়েছে, যে অসৎএর সাথে অসৎ ব্যবহার করেও সৎ থাকা যায়।

মা : হ্যাঁ তাই না? বেশ্যা হলেও সৎ থাকা যায়! খুন করলেও সৎ থাকা যায়। আর কত বলবে?—যাকগে, এখন কি চাও বলত?

শি : আপনার আইনের কি হবে? আপনার ছেলের সারা জীবনের শান্তির?

মা : সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না!

[ডাক্তার ঢোকে]

ডাঃ : মা তুমি পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ? কেন?

[এক মুহূর্ত চুপ সব]

মা : না। আর দরকার নেই।

ডাঃ : ওঃ। (চলে যায়)

মা : বল এবারে কি চাও। কি হ'লে আমাদের মুক্তি দেবে।

শি : এক গ্লাস জল চাই। জল খাব।

মা : ওঃ। চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে বলছি সে কথা! কাল সকালে অমুও কি যাবে তোমার সঙ্গে ?

শি : (অন্যমনস্ক) কোথায় ?

মা : অমু যার জন্যে টেলিফোন করতে গেল !

শি : আমি জানি না !

মা : এখন থেকে কি তুমি যা বলবে তাই শুনেই আমাকে চলতে হবে ?

শি : (অবাক হয়ে) কেন ?

মা : তার চেয়ে এক কাজ কর না। তোমরাই এখানে থাক। আমাকে কাশী-টাশী কোথাও পাঠিয়ে দাও।

শি : আপনার কথা ভাববার সময় আমার নেই।

মা : এতদূর !

শি : আমাকে একটু জল দেবেন না ?

(ডাক্তার ঢোকে)

ডা : ওরা সবাই চলে গেল।

[আবার একটু চুপ]

মা চল তোমাকে ওপরে দিয়ে আসি।

[ডাক্তারের ওপর ভর দিয়ে মা উঠে দাঁড়ায়। পেছনে চাকর এসে দাঁড়িয়েছে। মা চাকরকে দেখতে পায়]

মা : ওরে! এই—একে—শিবানীকে এক গেলাস জল দে। আর আর তরুবালাকে বল আমায় নিয়ে যাবে। আর বৌমার ঘরটা খোল গিয়ে।

[চাকর বেরিয়ে যায়]

ডাঃ: চল। শিবানী একটু বোস, আসছি আমি।

[শিবানী দাঁড়িয়েই থাকে। ঘড়িতে একটা ঘণ্টার আওয়াজ। ব্যাগটা একবার খোলে আবার বন্ধ করে। চাকর জল নিয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে জলটা নেয়। খেতে গিয়ে নামিয়ে রাখে। যদিও বোঝা যায় পিপাসা প্রচণ্ড]

শি: (চাকরকে) তুমি যাও, গেলাসটা পরে নিয়ে যেও।

[চাকর চলে যায়]

[শিবানী তাড়াতাড়ি ওষুধের শিশি থেকে সবগুলো বড়ি নিজের বাঁ হাতে ঢেলে নেয়। জলের গ্লাসে হাত দেয়। ডাক্তার ঢোকে। শিবানী গ্লাস ছেড়ে শিশিটাকে ব্যাগ দিয়ে আড়াল করে। ডাক্তার লক্ষ্য করে না।]

ডাঃ: বোস শিবানী। তোমার সঙ্গে কতগুলো কথা ঠিক করে নিই। কাল খুব সকালে একটা প্লেন বম্বে যাবে। আমরা প্রথমে বম্বে যাব। সেখানে গিয়ে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, নার্সের ট্রেনিং নিতে তোমার আপত্তি নেই তো?

শি: নার্সের কি একটা ট্রেনিং আমার নেওয়া ছিল যেন!

ডাঃ: তাই নাকি? তবে সে যাই হোকগে। এটা করতে হবে এই কারণে যে—যাতে এদের সন্দেহ করবার সময়টা চলে যায়। এরা বিশ্বাস করুক যে পারুল পাকিস্তানে চ'লে গেছে। সেইজন্যেই ট্রেনিংটা নিতে হবে। আর নিতে হবে বম্বেতে।

শি: তারপর?

ডাঃ: তারপর, তোমার যেমন করে ইচ্ছে তুমি তেমনি করে বাঁচবে।

শি: আমার যদি ইচ্ছে হয় যে তোমার কাছে থেকে আমি বাঁচব। তুমি আমাকে একটা সামাজিক সম্মান দেবে। পারব কি তেমন ক'রে বাঁচতে?

ডাঃ : পারবে বোধহয়।

শি : আমার সমস্ত ইতিহাস জানবার পরেও ?

ডাঃ : ইতিহাসটা তো আর বর্তমান নয় !

শি : (একটু চুপ) তোমার কথা শুনে প্রচণ্ড লোভ হচ্ছে বাঁচবার। এখুনি অন্ততঃ মনে হ'চ্ছে অতীতটা সবটাই বুঝি কল্পনা। —কিন্তু নাঃ। হয় না তা।

ডাঃ : কেন ?

শি : নিজেকেই নিজের বিশ্বাস নেই।

ডাঃ : চারপাশের জগৎটা বদ্‌লে গেলে দেখবে বিশ্বাস আপনি ফিরে এসেছে।

শি : (প্রচণ্ড চাপা আবেগে) বিশ্বাস কর, হঠাৎ তোমাকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছে। দুঃস্বপ্নের দৈত্যগুলো যেন সত্যি কল্পনা ! আর এই রাতটা শুভরাত ! না না তোমাকে দেখতে এসে আমি ভুল করিনি ! অমল—। [হাতটা বাড়াতে যায় ডাক্তারের দিকে। কি যেন মনে পড়ে যায়। দুঃস্বপ্নের দৈত্য ফিরে আসে। কণ্ঠস্বর চাপা আর্তনাদে পরিবর্তিত হয়।]

কিন্তু পলাশের ছেলে ?—হয়না, হয়না, তা হয়না ! সেই তো তোমার কাছে এলাম ! যেদিন তোমাকে প্রথম দেখলাম সেদিন এলাম না কেন ?

ডাঃ : সেদিন যদি হাত পেতে নিতে পারতে, তবে আজই বা পারবে না কেন ?

শি : তখনও পলাশের ছেলে কোথাও ছিল না। আর পলাশও—।

ডাঃ : তাতে কিছু এসে যায় না। আর ও ছেলের বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবার সম্ভাবনাই যদি থাকে—তবে—না জন্মালেও ক্ষতি নেই।

শি : (নেশাগ্রস্তের মত) না, না, তুমি আমাকে লোভ দেখিও না।

আজকে রাত্রের মত ইঁদুরটা ত' একটা গর্ত পেয়েছে, কাল আবার নাও পেতে পারে।

ডাঃ : কি বলছ বানী ? তার মানে ?

শি : আমার ভয় করে, ভীষণ ভয় করে কাল সকালেও কি তুমি এই মানুষ থাকবে ? যদি না থাক।

ডাঃ : তাহলে বল যে ভয় অ মাকে ;

শি : না, না, আমাকেও। এত বছরের পাকা দাগ। আমার মনের কি এত জোর হবে ? অনেক দিন আমি তোমাকে মনে মনে দোষ দিয়েছি — তোমার মনের জোর কম বলে। কেন তুমি বিয়ে করলে বলে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমারও তো মনের জোর কমই ছিল না হলে— আমার ওপর রাগ করে—সে লোকটার সঙ্গে অমন ভাবে মিশলাম কেন ?

ডাঃ : কে সে ?

শি : যে বিয়ে করবার লোভ দেখিয়ে, আস্তে আস্তে আমাকে এইখানে দাঁড় করিয়ে দিলে। মনের জোর থাকলে সত্যি কি এমনভাবে এমনটা হত। না না আজ রাত্রেই আমায় মরতে হবে।

ডাঃ : কি। মরবে ?

শি : তা ছাড়া সত্যি আমার কোন পথ নেই !

ডাঃ : পথ নেই ? এখন যখন আমি বুঝতে পারছি—সমস্ত ব্যাপারটাই সহজ হয়ে এসেছে—। সত্যি, শবানী, আমার মনের সমস্ত দ্বিধা কেটে গেছে। এমনকি মা পর্যন্ত তোমাকে মেনে নিয়েছে—।

শি : তুমি তো জান না, কেন তিনি মেনে নিয়েছেন।

ডাঃ : কেন ?

শি : ভয়ে। তিনি পুলিশ ডাকতে চাচ্ছিলেন আমি ভয় দেখালাম।

ডাঃ : কিসের ভয় ?

শি : তোমার এবং তাঁর চিঠি আমার কাছে আছে ! আমি সেগুলো

দেখিয়ে কেলেঙ্কারী করতে পারি, সেই ভয় ! কখনও কাঁদতে হবে। কখনও ভয় দেখাতে হবে, কখনও—হয়ত—। এমনি করে বেঁচে থাকতে হবে ? কেন ? অনর্থক এ সময় নষ্ট কেন ? তারপর শরীরের এই অবস্থা, কুৎসিত রোগে—

ডাঃ : তার চিকিৎসা হতে পারে !

শি : পারব না, আমি পারব না। গায়ের দাগগুলোর দিকে তাকাব, আর তোমার পাশে দাঁড়াব ? হয় না, হয় না। তার চেযে আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দাও না কেন ?

ডাঃ : আমার সামনে আমি তোমাকে মরতে দেব ? তাও তো হয় না।

শি : আজকের মত রাত কি আর পাওয়া যাবে ? উপায় নেই, আমার কোন উপায় নেই। এমন তো হতে পারে কাল সবাই আমাকে চিনে ফেলল ; আরও কত কি হতে পারে। তাই অন্তহীন অশান্তি থেকে বাঁচবার জন্যে আমাকে মরেই বাঁচতে দাও।

ডাঃ : সত্যি পার না তুমি ? অশান্তি অন্তহীন হয়ে চিরকাল থাকবে কেন ?

শি : বাইরের ভয়, ভেতরের ভয়, কত যুদ্ধ করব আমি ?—আচ্ছা কাল যদি কেউ আমাকে চিনতে পারে, তখন তুমি পারবে আমার পাশে দাঁড়াতে ?

ডাঃ : (স্থির দৃষ্টিতে তাকিযে থাকে শিবানীর মুখের দিকে) যদি না পারি, দুজনেই এক সঙ্গে মরা যাবে।—হযতো এই বয়সে বাইরের লোকের কাছে হাস্যকরই লাগতে পারে। তবু—।

শি : (একটু যেন ভয়ে) না, না।—আচ্ছ , আমি যদি হঠাৎ এখানে মরে যাই, তুমি শিবানী পুরকায়স্থের নামে একটা ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পার না ?

ডাঃ : দেব।

শি : আঃ বাঁচালে, না হলে ওরা আমার দেহটাকে নিয়ে কাটাছেঁড়া

করত তো আবার। তোমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তোমার বাড়িতে বেড়াতে এসে হঠাৎ মারা গেছে। তাই সৎকার তো তোমাকেই করতে হবে। এই ভিক্ষেটুকু তোমার কাছে না চেয়ে আমার উপায় নেই।

ডাঃ : কিন্তু সে কথা—।

[পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। দুজনেই উৎকর্ণ। ডাক্তার বেরিয়ে যায়। শিবানী আবার জলের গেলাস তুলে নেয় মুখের কাছে। চাকর ঢোকে।]

চা : আপনার জল খাওয়া এখনও হয়নি!

[শিবানী চমকে গেলাস নামায়]

শি : না।

চা : মা আপনাকে ওপরে এসে খেয়ে নিতে বলছেন।

শি : আচ্ছা তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

চা : জলটা খেয়ে নেন না, গেলাসটা নিয়ে যাই।

শি : (হতাশায়) যাচ্ছি! তুমি গিয়ে মাকে বল না যে আমি আসছি এখুনি।

[চাকর চলে যায়। শিবানী আবার জলের গেলাস তুলে নেয়। বাঁ হাতটা উঠে আসে মুখের কাছে। ডাক্তার আসে। শিবানী বাঁ হাতটা লুকোয়]

ডাঃ : থানা থেকে টেলিফোন করেছিল।

শি : (ভয়ে) কেন? জানতে পেরেছে নাকি?

ডাঃ : হালিমকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে খুনের দায়ে।

শি : হালিম চাচাকে?

ডাঃ : হ্যাঁ। আর হালিম নাকি একবার আমাকে ডাকবার জন্ত ওদের বারে বারে অনুরোধ করছে। তাই—।

শি: হালিম চাচাকে ধরেছে ওরা ?

ডা: : হ্যাঁ, ঐরকম আঘাত একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে দেওয়া নাকি সম্ভব নয়। তাছাড়া পলাশের চ্যালারা নাকি বলেছে, পলাশকে ও অনেকবারই ভয় দেখিয়েছে !

শি: যদি দেখিয়ে থাকে তা'হলে আমার জন্যেই দেখিয়েছে ! (হঠাৎ হেসে ওঠে) হ'ল না, হ'ল না !

ডা: : কি হ'ল না !

শি: ইঁদুরটার একটা গর্ত পাওয়া হ'ল না। বড় আশা করেছিলাম, আজকের রাতটাই শেষ রাত হবে ! কিন্তু না আবারও সূর্যোদয় আমাকে দেখতে হবে। সূর্যোদয়ের ওপর এত ঘেন্না কোথাও দেখেছ কি ?

ডা: : এ সমস্ত বলছ কেন ?—আমি যাচ্ছি থানায়। দেখি কি করতে পারি।

শি: কিচ্ছু করতে পারবে না ! ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম— বাঘে আর পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা। পলাশের জীবনের পরিবর্তে আর একটা জীবন পুলিশেরও চাই, আর পলাশের লোকদেরও চাই। তাই পারুল না যাওয়া পর্যন্ত হালিম চাচার নিষ্কৃতি নেই ! হ'ল না !

[বাঁ হাতটা খুলে বড়িগুলো ফেলে টেবিলের ওপর]

ডা: : একি ! এ তুমি কোথায় পেয়েছিলে ?

শি: তোমার আলমারিতে ! কিন্তু দরকারে লাগল না ! যাক্। তোমাকে হয়তো আমাকে নিয়ে বা আমার মৃতদেহটাকে নিয়ে বিপদে পড়তে হ'ত। ভগবান রক্ষে করলেন ! আচ্ছা যাই !

ডা: : রানী ! শোন—।

শি: আর কোন উপায় নেই ডাক্তার !—আচ্ছা, তোমাকে ডাক্তার ব'লে অনেক চিঠি লিখেছিলাম একসময়ে, না ?—ও: দাঁড়াও—

পাকিস্থানে যাব বলে তোমার সব চিঠিগুলো এই ব্যাগটায় ভরে নিয়েছিলাম, রেখে দাও এগুলো! (চিঠি বার করতে থাকে)—যাওয়া মাত্র ওরা নিশ্চয়ই ব্যাগটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে!

ডাঃ : এগুলো এতদিন তুমি রেখে দিয়েছিলে?

শি : [কথাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে বলবার চেষ্টা করে]
হাঁ! যে অবস্থাতে যেখানেই থেকেছি, এগুলো একখানাও সঙ্গছাড়া করিনি! প্রথম দিকে মাঝে মাঝেই পড়ে দেখতাম। তারপর এই দশ বছরে বড় পড়িনি, কিন্তু ফেলেও দিতে পারিনি! বাঁধনার কমাটা মনে হলে বাধা দিচ্ছে কেবল। ভেবেছিলাম মরবার সময় পর্যন্ত এগুলো কাছেই রাখব। রাখতে সাধ হয়েছে! কিন্তু আজ যেখানে যেতে হচ্ছে সেখানে এগুলো—(হঠাৎ থেমে যায়, তারপর আবার চেষ্টা করে বলে) এখন দেখছি তোমার চেয়েও তোমার চিঠিগুলোর ওপরেই মায়া পড়েছিল বেশী! ওগুলো আমার অনেক দিনের সঙ্গী।

ডাঃ : (অত্যন্ত অভিভূত, নিচু স্বরে) বাণী দাঁড়াও, এমন করে সব শেষ হতে পারে না! না, না একটা উপায়—। আমি আগে থানায় গিয়ে দেখি—!

শি : অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ নেই। (হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে) দেখছ না—ভগবান আমার বিপক্ষে? আমাকে ঐ ইঁদুরের মতই মরতে হবে—গর্তের বাইরে! এই, এই আমার ভাগ্য। আমি নিজে কত চেষ্টা করলাম, তুমিও তো একটু আগে কত চেষ্টা করলে—হ'ল কি কিছু? হালিম, হালিম চাচা, আমার একমাত্র বন্ধু,—তাকে যত তাড়াতাড়ি পারি আশ্বস্ত করাই কি আমার উচিত নয়!

ডাঃ : কিন্তু—।

শি : হালিম চাচার বাড়ি গয়াজেলার কাছে কোথায় যেন ! সেখানে ওর বৌ, ওর ছেলে মেয়েরা থাকে। প্রত্যেক মাসে ও টাকা পাঠালে তবে নাকি চলে তাদের ! তাই কোথাও আর কোন কিছু থাকলে চলবে কেন ?—চলি—

[দরজা পর্যন্ত চলে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়]

ডা: : বানী—। (গলা বন্ধ হ'য়ে আসে যেন)

শি : আমার ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে !

ডা: : [কাছে এগিয়ে যায়। হঠাৎ হাত ধরে] তবে থাক। বানী—। [একটু স্তব্ধতা]

শি : নাঃ ! আজকে তোমার কাছে যা পেলাম, তাই দিয়ে বাকী দিনকটা কাটিয়ে দিতে পারব মনে হয়। আমার জন্তে এইটুকু শুধু কামনা করো, ততটুকু মনের জোর শেষদিন পর্যন্ত যেন আমার থাকে।

ডা: : চল আমি তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।

শি : না। এ যাত্রার ডাক কেবল আমার একলার জন্তে। একলাই যেতে হবে।—আচ্ছা ডাক্তার, চলি।

[দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ডাক্তার চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। পর্দা নেমে আসে]

সুতরাং

প্রযোজনা—বহুরূপী

প্রথম রজনীর অভিনয়ের চরিত্রলিপি

সত্যব্রত—অরিজিৎ গুহ।

সুব্রতা—তৃপ্তি মিত্র।

লক্ষীবুড়ো/অজিত/নারাণ/ — কুমার রায়।

গোপালের মা/কুন্তলা/চামেলী/ — গীতা চক্রবর্তী।

মণ্টু/ফটিক/দীনু—দেবতোষ ঘোষ।

ফুন্টু/অভী/কিবলিস—শঙ্কর ঘোষ।

গুপ্ত/মদনবাবু—শান্তি দাস।

লোকটি—অসিত দাশগুপ্ত

রামজী সিং—উৎপল ভট্টাচার্য

অন্যান্য ভূমিকায়—সমীর চ্যাটার্জি, অজয় সেনগুপ্ত, শ্যামজীবন ঘোষাল।

সুতরাং!

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[কোলকাতার কাছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কোন জায়গা। নিম্ন মধ্যবিত্তের বাড়ি। মঞ্চ সাজানোর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। পর্দা উঠলেই দেখা যায়, অল্প আলোয় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে উত্তেজিত হয়ে কোন আলোচনা করছে; কিন্তু কোন কথা শোনা যায় না। আলো বাড়ল, এইবার তাদের স্পষ্ট দেখা গেল। ছেলেটির হাতে একটা পিস্তল।]

সত্য: হল তো? এবার ধর। আরে না না, ও রকম করে না। এই রকম করে ধর। আরে কী হল?

সুব্রতা: না রে আমি পারবো না। ও আমার দ্বারা হবে না।

স: হতেই হবে। অবস্থা দেখছিস না চারদিকের। নে ধর, একটা অনেস্ট এফার্ট তো করবি।

সু: আমার ভয় করছে, আমি পারবো না।

স: ওঃ আর চোখের সামনে যদি আমাকে খুন করে যায়—তখন দেখতে পারবি তো?

সু: চুপ কর। অলুক্ষুণে কথা বলবি না?

স: অলুক্ষুণে! বেশ না হয় নাই বললাম। কিন্তু অনন্তদার কথা মনে পড়ে না?

সু: আঃ তুই চুপ করবি—

স: তোর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল তবু—

সু: কিন্তু ভেবে দেখ। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে কী করে আমি—অনেক রক্ত বেরুবে তো তার। তার মা থাকতে পারে, তার বোন থাকতে পারে—

স: আর যেমন অনন্তদার তুই ছিলি, কিংবা তোর চাইতে আর একটু

ভাল অবস্থা তার। হয়তো সে বিবাহিতা স্ত্রী। আর তোর তো বিয়েই হল না।

সু : হ্যাঁ, আমার বিয়ে হোল না। সেদিন আমার নিজের চাইতে বাবার জন্যে বেশী কষ্ট হচ্ছিল। বাবা ধার দেনা করে আমার জন্যে গয়না গড়িয়ে এনেছিল।

স : আর যেদিন বাবা গয়নাগুলো বাড়িতে আনলো, সেই দিনই—মনে আছে, মনে আছে, দিদি ?

সু : আছে, আছে সব মনে আছে।

স : তবে কিন্তু-কিন্তু করছিস কেন ?

সু : কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম অনেক রক্ত পড়েছিল ওর। অনেক রক্ত। উঃ সেইদিন, সেইদিন ছিল একটা বিশেষ দিন। আমি সারাদিন রান্নাবান্না করে, গা ধুয়ে ও আসবে বলে অপেক্ষা করছিলাম।

স : কিন্তু অনন্তদা এল না। [সত্য অন্ধকারে মিলিয়ে গেল]

সু : তার বদলে এলি তুই। [দৃশ্যান্তর, আবহ সংগীত এবং আলোর বদল। সুব্রতা গুনগুন করে গান গাইছে। সত্য খুব দ্রুত প্রবেশ করে।]

সু : কীরে, কী হয়েছে ?

স : কী আবার হবে ?

সু : কিছু যেন লুকোচ্ছিস্ ?

স : কী আবার লুকোবো ?

সু : তুই যখন ঘরে ঢুকলি, মনে হল তোকে কে যেন তাড়া করেছে।

স : বাবা ফেরেনি ?

সু : না, বাবা একটা টিউশনি নিয়েছে। হ্যাঁরে, অনন্তদা এখনো এলো না কেন রে ?

স : রোজ তো আর অনন্তদা আসে না।

সু : বারে আজ যে অনন্তদার জন্মদিন, আমি পায়েস রান্না করেছি।

স : ফেলে দে।

সু : ঐ রকম করে কথা বলছিস কেন রে ? বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশে খুব ওস্তাদ হয়েছ ? না ?

স : অনুদার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না।

সু : তোর হুকুমে ? [কিছু লোকের গলার আওয়াজ] কিরে তুই অমন চমকে উঠলি কেন ?

স : ও কিছু না।

সু : বিয়ে হবে না কেন বললি ?

স : ওটা একটা কথার কথা। অনুদার বাবা কী সব টাকার কথা বলছিল না ?

সু : ন্যাকা ! অনুদা যেন বাবাকে কেয়ার করছে বিয়ের ব্যাপারে। এতদিন পরে অনুদার বাবার টাকা চাইবার কথা উঠছে কিসে রে ?

স : না, মাঝে মাঝে কঞ্জুস বুড়োর মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সু : অবশ্য একটা কথা ঠিক। বাবা হয়তো ওই ভেবেই—টিউশনি নিয়েছে আর একটা।

স : আরও একটা ? বাঃ বাঃ চমৎকার !

সু : আমি অনেক করে বারণ করেছিলাম। অনুদাও খুব রাগ করেছিল। বাবা বলে—আরে ওসব না। সু বি আমার একটা মেয়ে। আমারও তো গলায় কানে একটু সোনা দিতে ইচ্ছে করে, না কি !

স : তোমারও একটু লোভ ছিল। কিন্তু—

সু : কী কিন্তু ?

স : না, কিছু না, এমনি—

সু : কী হয়েছে রে ? বেশ বাবা, না বললি না বললি। একটা কাজ করবি ?

স : কী ?

সু : একটু দেখে আসবি অনুদা বাড়ি ফিরেছে কিনা ?

স : আমি পারবো না।

সু : তুই আজ এমন করছিস কেন রে ?

[বাইরে কথার আওয়াজ]

স : দিদি, কেউ ডাকলে বলিস, আমি বাড়ি নেই।

সু : কেন ? [বাইরে কণ্ঠস্বর "সত্য, এই সত্য !"] সত্য বাড়ি নেই। [কণ্ঠস্বর : "সত্যি !"] সত্যি না তো কি মিথ্যে ! [ফিরলে বলবেন লালুদা ডেকেছে। বেশী চপ দেবার চেষ্টা না করে তাড়াতাড়ি যেতে বলবেন।"]

সু : এই সতু, কোথায় কী করে এসেছিস ?

স : আমি কিছু করি নি।

সু : তবে ? বল সতু, বল।

স : আমি যে দেখে ফেলেছি রে দিদি, আমি যে শুনে ফেলেছি।

সু : কী দেখে ফেলেছিস ? কী শুনে ফেলেছিস ?

স : ঐ ডোবাটার ও পাশের পোড়ো বাড়িটার কথা মনে আছে তোর ? ছোটবেলায় আমরা ওখানে খেলতে যেতাম, আর কী ভয় করতো ?

সু : আমার কিন্তু ভয় করতো না। না না, করতো। একটু একটু করতো। ভয় ছাপিয়ে একটা জিনিস মনে হোত। মানে আমি স্বপ্ন দেখতাম—হঠাৎ কোন গুপ্তধন পেয়ে যাবো ওখানে। যা আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দেবে। মা-র তখন কী ভয়ানক অসুখ। কিন্তু ওখানে কী হয়েছে ?

স : অনুদার সঙ্গে বিয়ের কথা ভুলে যা।

সু : কী হয়েছে ? সত্যি করে বল সতু।

স : লালু পালেরা ওখানে অনন্তদার বিচার করছে।

সু : কী ! দু বছর আগে তো অনুদা ওদের পার্টি ছেড়ে দিয়েছিল, দু'বছর পর তার বিচার কেন ? কিসের বিচার ?

স : বিচারও ঠিক নয় রে দিদি—ওরা অনুদাকে খুন করবে।

সু : সতু—[সত্য সুব্রতার মুখ চেপে ধরে]

স : চেঁচাসনি দিদি। যদি বাঁচতে চাস, বিয়ের কথা ভুলে যা। অনুদার কথা ভুলে যা।

সু : আমি যাবো। [যেতে চায়। সত্য আটকায।]

স : পাগলামি করিস নি দিদি মরবি।

সু : আমি বাঁচতে চাই না। আমাকে ছেড়ে দে।

স : কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। তুই ওখানে গেলে সবাই বুঝতে পারবে না আমি তোকে বলেছি ?

সু : আমি তাহলে কী করবো ?

স : কিচ্ছু না।

সু : আমার কথা ছেড়ে দে ! অনন্তদা না থাকলে আমরা বাঁচতাম ? তোর লেখাপড়া হত ?

স : লেখাপড়া হয়ে কী হল ?

সু : কী হল ?

স : হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতগুলো স্বপ্ন দেখতে শিখলাম। কিন্তু তারপর—

সু : কিন্তু সেজন্য কি অনুদা দায়ী ?

স : হ্যাঁ। অনুদা, বাবা, তুই, তোরা সবাই। কিন্তু কী লাভ হবে এসব কথা ভেবে !

সু : আমায় যেতে দে। তুই কোথাও পালা।

স : কোথাও জায়গা নেই। আমি যে জেনে ফেলেছি।

সু : তাই যদি হয়, কোন উপায়ই যদি না থাকে, তাহলে কেন অনুদাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবি না ?

স : লাভ নেই। পারবো না। অনুদা মার্ক্‌ড্‌, চিহ্নিত। আমি চিহ্নিত হতে চাই না।

সু : আমি পুলিশে যাব।

স : পাগল, কী হবে। ওরা এসে বড় জোর ঐ 'কচি' বলে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাবে। ঐ যে বিধবা মায়ের ছেলে সম্প্রতি ওদের দলে যোগ দিয়েছে। ওর মত দু একটা ধরতে পারে। মার দিয়ে আধমরাও করতে পারে। কিন্তু লালুদাদের তাতে কিছু এসে যাবে না—অনুদাও বাঁচবে না।

সু : ওরে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

স : ঘটনাটা ঘটে গেলে ওতে কিছু এসে যাবে না।

সু : তোর মন নেই, হৃদয় নেই।

স : তাই বেঁচে আছি।

সু : জানোয়ার, দরজা ছেড়ে দে বলছি!

স : সামান্য একটা মানুষ অনুদা—স্বপ্ন দেখতো, আমাদেরও স্বপ্ন দেখাত। কিন্তু কী এসে যায় তাতে বল? [বাইরে গুলির আওয়াজ। সুব্রতা আর্তনাদ করতে যায়। সত্য ওর মুখ চেপে ধরে। সুব্রতা অবশ হয়ে যায়। সত্য ওকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দেয়।] সামান্য একটা মানুষ অনন্ত বসু। কী এসে যায়, এঁ্যা! অনন্ত বসু—যে আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল। ঐ যারা ওকে গুলি করল, তাদেরও শিখিয়েছিল। আজ যদি আমরা অনন্তদাকে বাঁচাতে যেতাম—পারতাম না। একটা কথা আমি বুঝতে পারছি। এখুনি পারলাম। আমাকে আরও চালাক হতে হবে। বুদ্ধিটাতে শান দিতে হবে। যাতে এর শোধ একদিন নিতে পারি। অনন্তদাকে যারা মারল তাদের আমি ছাড়ব না দিদি। [সুব্রতা উঠে বসেছে। তার দৃষ্টিতে ভাষা নেই। সত্য দিদিকে ধরে নাড়া দেয়।]

স : দিদি, দিদি, আমার দিকে তাকা। শোন, অনন্তদা নেই। অনন্তদা মরে গেছে! মরে গেছে অনুদা। কিন্তু গুপ্তধন হয়ে ঐ পোড়' বাড়িতে থাকবে। কেউ জানবে না। দিদি কেবল তুই আর আমি—অনুদাকে নিয়ে একটা লুকোচুরি খেলা শুরু হবে তোতে আর আমাতে। বুদ্ধিটাকে বাড়াতে হবে দিদি। অনুদা মরে গেছে [সুব্রতা হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। আবার আগের জায়গায় সুব্রতা। সুব্রতা কাঁদছে। আগের দৃশ্য]

সু : কিন্তু গুপ্তধন হয়ে ত অনুদা থাকেনি।

স : না পুলিশে লাশটা নিয়ে গিয়েছিল। বত্রিশটা ছোরার আঘাতের ওপর একট পিস্তলের মোক্ষম মার ছিল মাথার পাশে। অনুদার মৃত্যুর ছ দিন পর পুলিশ দেহটা আবিষ্কার করলো, না?

সু : হ্যাঁ। তার তিন দিন পরে বাবার হার্ট অ্যাটাক হল। পুলিশ এমন ভাবে কথা বলছিল যেন আমাদের বাবাকে আমরাই খুন করেছি।

স : সত্যি। যারা খুন করে তাদের ধরতে পারে না।

সু : ইচ্ছে করলে সবই পারে।

স : এক বছর হয়ে গেল—আমাকে ধরতে পেরেছে?

সু : সত্য! ও কথা উচ্চারণ করিস না। এখানকার হাওয়ায় কথা উড়িয়ে নিয়ে যায়।

স : কিন্তু ভাবতেও ভাল লাগে রে দিদি, যে, ঐ লালু পাল আর পৃথিবীতে নেই।

সু : কিন্তু ওর চেলারা আছে।

স : তাই তো বলছি দিদি, ওর চেলারা যেদিন মারতে আসবে—

সু : আসবে?

স : আসবেই। সেদিন তোকে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে না হয়।

সু : না। কাঁদবো না। কেঁদে যে কিছু হয় না তাতো জানি। কিন্তু

তবু কাঁদি—আবার ভাত খাই। ভাত খাই বলে রেশনে লাইন দি, কেরোসিনে লাইন দি, জলে লাইন দি। কাঁদি, তারপর আবার উনুন ধরাই, কুটনো কুটি, ভাতের জল চাপাই—আবার কাঁদি—তরকারীতে স্বাদ আনার জন্মে বাগানে লঙ্কা তুলতে যাই—আবার কাঁদি! এই যা—একদম ভুলে গেছি!

স : কী ভুলে গেলি?

সু : তুই সকালে যাবার সময় বলে গে'লি না, তোর বাগানে জল দিতে—বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হ'ল—

স : কী আশ্চর্য, তুই জল দিসনি! আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোকে পিস্তল চালানো—যাঃ চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলো বোধ হয়—[সত্য বাগানে চলে যায়। কোথাও কোন আশ্রম জাতীয় জায়গা থেকে সংকীর্তনের সঙ্গে প্রচণ্ড খোল করতাল বেজে ওঠে।]

সু : এই শোন. তোর কুমড়ো পাতাগুলোতে বোধ হয় পোকা লেগেছে, একবার দেখে নিস। প্রথম যখন এ পাড়ায় আসি তখন ১০।১২ বছর বয়স আমার। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কী একটা ব্যাপারে পালিয়ে নৌকো স্টীমার, রেল, তারপর হাঁটা পথ—বেনেপোল—একে টাকা, ওকে গয়না দিতে দিতে বাবা আর মা যখন আমাদের নিয়ে এখানে এসে পৌছালো তখন, তখন সব নিঃশেষ। সতু তখন এইটুকখানি, একটুকু এক বাচ্চা। তখন ঐ অনুদা, অনন্ত বসু নিজের বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এই জায়গাটা আমাদের পাইয়ে দিল। কোথা থেকে কী ঋণ এনে দিল বাবাকে—ঘর উঠল—বাবা ওই ছোট বাগানটা করলো। কিন্তু মা-র কী যে অসুখ হল! বাগান করার ধাতটা সতু অবিকল বাবার মত পেয়েছে। কিন্তু এই খুন করবার ধাত? সে বুঝি এই শহরগুলির ধাত? নাকি রাজনীতির শিকারদের বুঝি এই রকম ধাত হয় কিন্তু অনুদা, অনুদা তো কাউকে—তবে কেন এমনভাবে—উঃ মাগো! সত্য

প্রতিশোধ নিয়েছে। লালু পালের দেহটাকে অনেক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। লালু পাল তো শহীদ! আর অনন্তদা—! সত্যকে ওরা ডাকতে এসেছিল—সত্য তখন জ্বরে অজ্ঞান। ওরা জানতো সত্য ওদেরই একজন। অনন্তদার মৃত্যু—বাবার মৃত্যু, সত্যকে ধূর্ত করে তুলেছে। আর আমাকে—আমি কী করতে চাই আমি জানি না। [কেঁদে ফেলে। সত্য ঢোকে—হাতে দুটো ফুল।]

স : এই নে! গাছে জল দিসনি বলে এই একটা পুরস্কার। (একটা ফুল দেয়) আর পিস্তল ছোঁড়া শিখতে পারিসনি বলে এই আর একটা···। এইবার একটু চা কর। নাকি আমি নিজেই করে নেব? তুই বরং বসে বসে ভাব আর একটু কাঁদ। ওরে কেন এমন হল রে! ওরে গত বছর কত ভাল ছিলুম রে! ওরে সত্যর চাকরিটা কবে পাকা হবে রে! হাসছিস কী? কাঁদ। আমি বলে তোকে হেল্প্ করবার চেষ্টা করছিলাম আর তুই হাসছিস। যাই চা-টা করে ফেলি—তোর চায়ে চিনি দেবো না নুন দেবো? চিনি দিলে চোখের জল পড়ে বিচ্ছিরি বিস্বাদ হবে, তার চাইতে নুন দিই।

সু : কোথায় যাচ্ছিস্—আর আমাকে একটু হেল্প্ কর তোর কথাই ঠিক। তৈরী থাকতেই হবে। প্রতিশোধের যুগ তো!

স : (হাসি মুখে এগিয়ে আসে)। শোন্ আগে কয়েকটা খুব দরকারী কথা বলি। যদি একেবারে সরিয়ে ফেলতে হয়, আর খুব তাড়াতাড়ি, তাহলে সোজা বুকে এই রকম জায়গায়। আর কোন লোককে, ধর তুই কষ্ট দিতে না চাস, সরিয়ে ফেলতে চাস জানতেই দিতে চাস না—তাহলে ঘুমের মধ্যে মাথার ঠিক এই জায়গাটাতে। আর যদি সিচুয়েশন এমন হয় যে···তাহলে যে কোন জায়গায়।

তলপেটে মারলে অনেকক্ষণ ছটফট করবে—আর বুঝতে পারবে তো যে এইবার মরতে হবে অথচ কিছু করবার থাকবে না। নে ধর, এইবার টান।

সু : কিন্তু আওয়াজ হবে যে!

স : ধুর! আজকাল এরকম আওয়াজ তো এখানে ওখানে কত জায়গায় হচ্ছে। পাশের আশ্রমে কীর্তন হচ্ছে, তার হরে কৃষ্ণ হরে রামের আড়ালে…

[গুলির আওয়াজ। অন্য দৃশ্য, দুটি ছেলে।]

১ম : সমস্ত ব্যাপারটাই বাজে। চারদিন হয়ে গেল একটা লোকের খবর নেই…আর…

২য় : এ রকম কি প্রথম হল নাকি? যত ছেলে এখান থেকে নিখোঁজ হয়েছে সবার খবর পাওয়া গেছে?

১ম : ঠিক। আর যখন পাওয়া যায় তখন মানুষটা আর মানুষ থাকে না—লাশ হয়ে যায়।

২য় : ফের শালা লাশ। হাজারবার বলেছি না যে লাশ বলবি না, বলবি নিরুদ্দেশ।

১ম : সুবিদিটার কপালই খারাপ। অনন্তদাটা ওই রকমভাবে মারা গেল—বাবাটা তার পরেই গেল, এখন ভাইটার খবর নেই।

২য় : এখন কোনদিন আর খবর এলে হয়।

১ম : তাহলে মাইরি সুবিদিটা কী করবে?

২য় : কিছু ভাবনা নেই রে—কথায় আছে না—তুমি যাও বঙ্গে কপাল আছে সঙ্গে। কপাল ঠিক একদিকে নিয়ে যাবে। মেয়েছেলের কপাল সাংঘাতিক কপাল রে। কে জানে! লক্ষ্মী বুড়োর সেবা করে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে কিনা?

১ম : সুবিদি!

২য় : আরে যাঃ যাঃ ওরকম অনেক দেখা যায়। জানি জানি প্রথমে

আমরাই সিটি দেবো—রাস্তায় চলার বায়োটা বাজাবো—তারপর সুবিদি যখন অনেক পয়সা করবে—তখন ফাংশনে সুবিদিকেই প্রেসিডেন্ট করে নিয়ে আসবো।

১ম : মাইরি। আমরা শালারা এক একটা চীজ রে!

২য় : শুধু তাই নয়রে। যে সব বড় বড় লোক প্রধান অতিথি হয়ে আসবে, তারা সুবিদির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে।

২য় : কথাটা ওরকম ভাবে বলবার কিছু নেই। যারা জাল করছে, খাবারে ওষুধে ভেজাল দিচ্ছে—ঐ লক্ষ্মী বুড়োরা, তাদের সঙ্গে যদি হ্যাণ্ডশেক করা যায় তবে এসব মেয়েরা তো তুচ্ছ, তুচ্ছ।

১ম : এই যা বলেছ রাজা।

২য় : বরং বল—আমাদের বলা উচিত, মাতৃগণ তোমাদের জন্য যাহা করার দরকার ছিল আমরা তাহা পারি নাই—সেজন্য আমাদের ক্ষমা করিও।

১ম : তুই শালা একেবারে ব্যাকডেটেড। আজকাল কারো জন্তে কেউ কিছু করে না। সব নিজের জন্তে। [সুব্রতা ঢোকে]

সু : এই যে ফুন্টু, কোন খবর এখনও পাওনি ?

ফুন্টু : ভাবনা নেই সুবিদি, এরকম কত হয়।

সু : তাই জন্তেই তো ভয়।

ফু : না না তা বলছি না—হয়তো কোন কারণে আপনাকে ঠিক বলে যেতে—

সন্টু : সতুদা! সতুদা তো ইন্টারভিউ দিতে গেছে।

সু : ইন্টারভিউ ? কোথায় ? কৈ আমাকে তো—

সন্ : কী করে বলবে ? পোস্ট অফিস থেকে তো চিঠিটা নিল। আমি তো বাই চান্স্ সেখানে ছিলাম। বলল "সন্টু, কাউকে বলিস না, ফিরে এসে দিদিকে এ্যাইসা একটা স্টান্ট দেব না।"

সু : বাঃ! তোমাকে এই রকম বলে গেছে, আর তুমি আমাকে বলোনি। বাঃ আশ্চর্য!

সন্ : কী করবো! সতুদা বারণ করল!

সু : তবু আমাকে তোমার বলা উচিত ছিল। ছিঃ ছিঃ, আমি চারদিন ধরে পাড়ার লোকদের উদ্ব্যস্ত করে বেড়াচ্ছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!
[চলে যায়]

ফু : এই, এরকম ঢপ দিলি কেন রে?

সন্ : মেয়েছেলের চোখে জল দেখলে আমার ভেতরটা হাঁচড় পাঁচড় করে। মাইরি এত কষ্ট হচ্ছে।

ফু : কিন্তু এখন কী হবে? এরপর যদি কিছু হয়, সুবিদি তো বলবে সন্টু অমুকদিন, অমুক সময় সতুকে দেখেছিল, তখন?

সন্ : মাইরি এতো দেখছি একটা কেলো হয়ে গেল। একদম মনে হয়নি এই কথাটা, মনে হল সুবিদিকে তো কাঁদতেই হবে সারাজীবন—একটা পুরিযা দিয়ে, দি এখন—গিয়ে ভাতটাত থাক্—

ফু : তুই কিন্তু ডেঞ্জারাসালি সাপের গর্তে পা দিলি! এ যে কে কোনদিক থেকে কী করছে বোঝবার জো নেই!

সন্ : যাক, যা হবার হবে। সাত বছর ধরে বেকার বসে আছি। বাড়িতে মা বলে ভাত দেব না, ছাই দেব। বাবা শালা তো কথাই বলে না। যদি এই হাঙ্গামায় কিছু হয়ে যায় তো হয়ে যাক্। আর ভাল্ লাগে না। বোস্। সেই সকাল দিয়ে একটা কথা মাথায় ঘুরছে মাইরি—তোকে তখন বললুম বটে কিন্তু সতুদাটা গেল কোথায়?

ফু : যায়নি। নিয়ে গেছে। একটা কথা কানে এসেছিল দোস্ত। কাউকে যদি না বলিস তো বলি।

সন্ : বল্ না তাড়াতাড়ি।

ফু : অনেকে সন্দেহ করছে, লালুদার খুনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে।

সন্: যাঃ তা কী করে হবে? ও তো বলতে গেলে লালুদার ডান হাত ছিল।

ফু: আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু—

সান্: তুই যা বলছিস তা যদি সত্যি হয় তাহলে একটা জায়গায় খোঁজ করা যায়।

ফু: কোথায়?

সন্: বেঁচে আছে কি না জানি না। ওদের টর্চার চেম্বার আছে না? তার পাশের গলিটার কাছে।

ফু: পাগল হয়েছিস নাকি? ওইখানে কে যাবে? জানের ভয় নেই? জানের মায়া থাকে তো এইখানে—

সন্: আরে না না। আমরা কি আর শোভাযাত্রা করে যাচ্ছি। তুই একদিক দিয়ে, আমি একদিক দিয়ে, গিয়ে ওঁকে নিয়ে ফের এইখানে এসে ডিসপার্স।

[ওরা চলে যায়। দৃশ্যান্তর। সুব্রতাদের বাড়ি]

সু: এ কী এক অন্ধকার যুগ! ভয়, খালি ভয়। আমাদের সমস্ত অনুভূতি চাপা পড়ে একটা অনুভূতিই বড় হয়ে উঠেছে—ভয়। আমরা কিছুই তো পাই না আমরা খেতে পাই না, কাপড় পাই না। শুধু নিজের লোকের একটু ভালবাসা, তাও পাব না। তাও আমরাই নষ্ট করে দেব? [চিৎকার করে। সত্য তুই কোথায়—সত্য! [লক্ষ্মীবাবুর প্রবেশ]

ল: সত্য কোথাও নেই।

সু: কোথাও নেই? আপনি জানেন নাকি? খবর পেয়েছেন কিছু?

ল: আমি কোত্থেকে খবর পাবো? তুমি সত্য সত্য করে চেঁচাচ্ছিলে, তাই বললুম, সত্য এ জগতে কোথাও নেই। আমি তোমার ভাই সত্যর কথা বলিনি। তোমার দুঃখুর কথা কদিনই শুনছি, তাই ভাবলাম একটা খবর নিয়ে যাই। গোপালের মা, মানে আমার

স্ত্রী, বলছিলো মেয়েটার দুঃখু দেখলে চোখে জল রাখা যায় না। একা একা বাড়িতে চমকে চমকে উঠছে। আমাদের বাড়িতে এসে কদিন থাকতে বলো।

সু: আপনাদের বাড়িতে? না না, তাহলে সত্যর গাছে জল দেবে কে?

ল: তুমি এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সে আমার অনেক লোকজন আছে, পাঠিয়ে দেব। চল, চল।

সু: তাছাড়া ইণ্টারভিউ দিয়ে যখন ফিরে আসবে—

ল: ইণ্টারভিউ দিতে গেছে? সত্য? [খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে] কে তোমায় বললে এসব কথা?

সু: [হঠাৎ সাবধান] ওঃ তা ইণ্টারভিউ দিতে যায়নি সে কথাই বা আপনাকে কে বললে?

ল: এখানে আর কে কী বলে বলো—সব বুঝে নিতে হয়।

সু: আপনি কী বুঝে নিয়েছেন?

ল: যে তুমি এবার থেকে আমাদের বাড়িতে থাকবে।

সু: কেন?

ল: একলা থাকা উচিত নয় বলে। বয়সটা তো ভাল নয়।

সু: আপনার বয়স তো বেশ ভাল জায়গায় পৌছেছে। আপনি একলা থাকেন না কেন?

ল: একলা, আমি? কোন্ দুঃখে? একলা থাকতে পারিও না, আর তোমাদেরও একলা রাখতে চাই না। শোন, ভাই আর ফিরবে না, এস। দুঃখ থাকবে না। কী করবো বলো আইনে আটকায়, নইলে বামুনের ছেলে শালগ্রাম শিলা রেখেই……

সু: তবে যে বলেছিলেন গোপালের মা দুঃখ দেখে আমাকে—

ল: ওটা বলতে হয়। তোমাকে একটু বুঝে নিচ্ছিলাম।

সু: তা কী বুঝলেন?

ল: সোজা আঙুলে না উঠলে বাঁকা আঙুল লাগে।

সু: তার দরকার হবে না। সত্যর খবর ঠিক করে বলুন। সত্যি করে বলুন। তাহলে আপনার সোজা আঙুল সোজাই থাকবে।

ল: সত্যি বিশ্বাস কর, সত্য আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

সু: কেন ?

ল: তোমার ভাই আর কোথাও নেই। কী করবে বল, সবই অদৃষ্ট ! চল এবারে।

সু: কোথায় ?

ল: ঐ যে বললে সোজা আঙুলেই হবে।

সু: ও আমি আপনাকে বুঝে নিচ্ছিলাম।

ল: দেখ, ভাল করলে না, ভেবেও দেখলে না। কারণ রেহাই তুমি পাবে না। ঐ লালুর চেলাচামুণ্ডারা তোমাকেও রেহাই দেবে না। তাছাড়া অনন্তর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা তো কারো জানতে বাকি নেই—বলতে গেলে তুমি তো তার রক্ষিতাই ছিলে।

সু: আপনি একটা আস্ত শয়তান !

ল: হেঁ, হেঁ, ডাক্তারের কাছে কী সব করতে টরতে গিয়েছিলে—

সু: মিথ্যে কথা। একেবারে মিথ্যে। কী সাংঘাতিক !

ল: আর সতীপনা দেখিও না। ডাক্তারের খাতায় সব লেখা আছে।

সু: বেশ, বেশ, যদি তাই হয়, তাতে আপনার কী এক্তিয়ার জন্মায় আমাকে এসব কথা বলায়। শয়তান, বদমাশ, পাজী কোথাকার।

ল: আহা যাও কোথাও। তুমি রাগলে না আমার বেশ ভাল লাগে। বেশ ঠিক আছে, তুমি এখানেই থাক, আমি এখানেই সব ব্যবস্থা করে দেব। [দূরে একটা আওয়াজ, লক্ষ্মীবাবু চমকে ওঠে।] ওঃ ভালো মানুষের কাল নেই। মনে রইল শয়তান, বদমাশ, পাজী,—সবগুলোরই নম্বর ধরা হবে। মনে রেখ এক মাঘে শীত পালায় না। [চলে যায়। ফুলটু ঢোকে।]

ফু: সুবিদি, সতুতার লাশ পড়ে আছে খালের ধারে।

সু : কী ?

ফু : আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। কেউ দেখলে বিপদে পড়বো। পুলিশে যান। যা হয় করুন, চললাম।

[দৃশ্যান্তর। লক্ষ্মীবাবুর বাড়ির সামনের দাওয়া।]

সন্টু : ঠিক শালা কাজের সময় লেট্, [ফুলটু শিস দিয়ে ঢোকে।] কী রে, দেরি কেন ?

ফু : ফিন্ শালা সেই হারুর হাঙ্গামা। কীরে তোর লক্ষ্মীবুড়ো কোথায় ?

সন্ : বোস্ না শালা চেপে সিট্-ডাউন্ করে। বুড়ো যখন কথা দিয়েছে ঠিক টাইম্লি অ্যাপিয়ার দেবে। সতুদাটা মাইরি বেঁচে গেল। কী জান রে !

ফু : সেই অজয়দা একবার কোন রাজার পুরুত না কার কথা বলেছিল —সেই যে বিষ খেয়ে হজম করে দিয়েছিল।

সন্ : রাজা না, রাজা না। জার, রাশিয়ার জার।

ফু : ওই হোলো। রাজাও যা জারও তা। পুরুতটার নাম কিরে ?

সন্ : রাসপুটিন—বিষ খেয়ে হজম করে দিয়েছিলো আর আমাদের সতুদা গুলি খেয়ে হজম করে দিলে—তিন তিনটে বুলেট !

ফু : তবে বলা যায় না ! এখনও হাসপাতালে। দেখ কী হয়।

সন্ : আরে ডেন্জার যখন পেরিয়ে গেছে তখন ভয় নেই। ও ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। চেহারাটা দেখিস্নি কী রকম পাট্টা জোয়ান।

ফু : সুবিদিরও মনের জোরের তারিফ করতে হয়। অত রাত্রে পুলিশ নিয়ে গিয়ে হাঙ্গামা করে লাশ নিয়ে এলো তো থানায়। আমি তো শালা বলেই ভোঁ দৌড়—রাত্রে শালা ভাত গিলতে পারি না। কেবলই মনে হয় কেউ বুঝি দেখে ফেলেছে—কেউ বুঝি দেখে ফেলেছে—সে এক কেচ্ছা।

স : তবে থানার দারোগাটা নতুন এসেছিল ভাই—আগেরটা থাকলে অত রাতে পুলিশ নিয়ে খালধারে যেত থোড়াই !

সু: কিন্তু বেঁচেই বা কী হবে বলো? সেই এইখানেই তো আসতে হবে। থাকগে পরের কথা অতো ভেবে কী হবে? দে, বিড়ি দে একটা। [লক্ষ্মীবাবুর প্রবেশ]

লক্ষ্মীবাবু: এই যে সন্টু ফুন্টু, শুনেছ, সতু আর সুবি নাকি আজ ফিরে আসছে কোলকাতা থেকে। তোমাদের দলের ঐ নিমে আর ফকরে আমার পিছনে লেগেছে। বলেছে, সতু ফিরে এলে নাকি আমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। এসব কী অন্যায় কথাবার্তা বল দিকি। মেয়েটা একলা বাড়িতে চমকে চমকে মরছে দেখে গোপালের মা আমাকে বললে—

গোপালের মা: গোপালের মা তোমাকে কোন কথা বলেনি। গোপালের মায়ের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—কোথায় কোন বয়স্থা মেয়ে চমকাচ্ছে, তাই দেখে দেখে বেড়াচ্ছে।

ল: তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে, এ্যা!

গো মা: এত বোমা চারদিকে ফাটছে, তোমার মাথায় একটা ফাটে না গা।

সন্: স্যার, আপনাদের দাম্পত্য কলহের ব্যাপারে আমাদের আর কেন —আমরা যাই।

ল: না না, বসো। [গোপালের মা কাছে যায়।]

ল: (হিংস্রভাবে) ভেতরে যাবে কি না? তোমার লেকচার শুনতে এখানে কেউ আসেনি। শংকর মাছের চাবুকের কথাটা ভুলে গেছ, না দাগটা মিলিয়ে গেছে।

গো মা: মাঝে মাঝে ভুলে যাই। সত্যি ভুলে যাই। যে কথা একলা তোমার সামনে বলতে ভয় পাই, সামনে লোক থাকলে সাহস আসে। তাই বলি তোমার সর্বনাশ হোক, তাই চাই! তবু কিছু হোক, কোথাও একটা কিছু হোক।

সন্ : তা হলে আমরা যাই স্যার ?

ল : আরে না না। তোমাদের কাকীমা তোমাদের জন্য চা করে আনছে। যাও তো একটু চায়ের ব্যবস্থা করো। [গোপালের মা চলে যায়] হ্যাঁ সন্টু, যে কথা বলছিলাম—বোস বোস। ভাখ, তোমাদের মত ছেলেদের আমি চিরকালই সাহায্য করে এসেছি এবং এখনও করবো লালুর দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, নাকি ?

সন্. ফু : আজ্ঞে তা তো গেছেই।

ল : এই দল—দল টিকিয়ে রাখা এও এক মস্ত আর্ট, মানে শিল্প বুঝলে না—লালু মরে গেল বস্তু আর একটা লালু হল না, তা না হলে তোমাদের এই সতুকে ঘাড়ে গর্দান নিয়ে ফিরতে হত—নাকি ?

সন্ : হ্যাঁ, সে তো একশোবার।

ল : তাই বলছিলাম, এমন একটা জোয়ান নেই যার পরে ভরসা করা যায়, সবই যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। কিন্তু এই এলোমেলো অবস্থাটা থাকা ঠিক বাঞ্ছনীয় নয়। লালুকে আমি সাহায্য করতাম। তাই তার দল শক্তিশালী হয়েছিল। তার শাগরেদগুলো কোন কাজের নয়; তা যাকগে। সন্টু তুমি যদি বাবা দল করো, তবে আমি তোমাদের সাহায্য করবো— যত টাকা লাগে দেব। তারপর তা দিয়ে তোমরা কালীপুজা কর কি বোমা বানাও, তাতে আমার দেখার দরকার নেই! টাকা দিচ্ছি বলে তোমাদের স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে ঐ নিমে আর ফকরেকে একটু শাসনে রাখবে। কে ওদের রসদ যোগান দিচ্ছে—সেটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া চাই। [সন্টু ফুন্টু পরস্পরের দিকে তাকায়।] সতুটা একটা গুণ্ডা, শয়তান, শেয়ালের মত ধূর্ত। লালুকে ওই খুন করেছে। কিন্তু এমন ভাবে করেছে, কোন ব্যাটা ধরতে পারলো না! ওকে তোমাদের শাসনে রাখতে হবে। তারপর অন্য দিকের ব্যবস্থা। তার জন্যে তোমাদের তৈরী করতে

যাবো না। আমার অন্যলোক আছে। কী রাজী? ঠিক আছে, ভেবে ঠিক কর। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি তোমাদের চায়ের ব্যবস্থাটা—[চলে যায়]

সন্ : কী শয়তান রে! উরি বাসরে।

ফু : কিন্তু চান্সটা ভেবে ত্যাখ সতুদা বেঁচে উঠেছে শুনেই লালুদার পয়লা নম্বর শাগরেদ ভোলা, সত্যি সত্যি নিরুদ্দেশ হয়েছে। এ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। ময়দান ফাঁকা। ভেবে ত্যাখ।

সন্ : সাত বছর বেকার। চাকরি হবে না নিশ্চিত। কী করব রে শালা, বল না?

ফু : বলছি তো। হিম্মত থাকে ঝুলে পড়। তবে তখন সুবিদি বা অমুককে তমুককে সিম্পাথি দেখানো চলবে না।

সন : ঐ যে বললো না, তোমরা খালি সতুর ওপর নজর রাখবে। অন্য ব্যবস্থা আমি দেখবো—তার মানে বুঝছিস তো?

ফু : তাই তো বলছি রে। তা সুবিদির কপালে যা থাকবে হবে। আমাদের তাতে কী?

সন্ : ঠিক বলেছিস। আমাদের কী? হ্যাঁরে এই এরিয়াটা পুরো আমাদের হবে? মাইরি?

ফু : পেট ভরে খাওয়া, ভাল সিগারেট, ভাল মাল, উরি বাপরে বাপ। [লক্ষ্মীবাবু ঢোকে]

সন্ : [উঠে দাঁড়িয়ে] সত্যি স্যার, আপনার কথাটা আমার মনে একটা উত্তেজনা এনে দিয়েছে। এই এরিয়াটাকে তো এই রকম লসেস্ করে ফেলে রাখা যায় না। বিশেষ করে সতুর মত গুণ্ডা যখন ফিরে আসছে।

ল : এস ভেতরে এস। তোমাদের কাকীমা তোমাদের জন্য চা আর ফুলুরি নিয়ে বসে আছে।

[দৃশ্যান্তর। সন্ধ্যে। দূরে হিন্দুস্থানীরা হোলির গান গাইছে। সত্য খেতে বসেছে। মঞ্চের মাঝখানে সুব্রতার ওপরে আলো]

সু: সেই—সেইদিন যখন ফুলটু এসে খবর দিল—দৌড়ে গেলাম খালের ধারে। মরা ভাইকে দেখব বলে দৌড়েছিলাম। স্থানকালের জ্ঞান ছিল না। গিয়ে দেখি গা তখনও গরম। কেমন যেন একটা আওয়াজ হোল। বললাম, ভগবান সতুকে বাঁচিয়ে দাও। দৌড়লাম থানায়। মনে পড়ল ফুলটু বলেছিল, পুলিশে যান, যা হয় করুন। কোথা থেকে অত শক্তি এসেছিল কে জানে। আজ মনেই পড়ে না ভাল করে থানার ও. সি-র মুখটা। কেবল মনে পড়ে কত দ্রুত পুলিশ নিয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন। মাঝে মাঝে এক একটা ব্যতিক্রম থাকে বলেই বোধহয় মানুষ আলো দেখে। তারপর কেমন করে কোলকাতায় হাসপাতালে পৌঁছলাম আমার মনে নেই। কানে এল সতুর দেহে অপারেশন হবে। হল। জ্ঞান আসবে, না আসবে না! এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। জ্ঞান এল। কোলকাতার ডাক্তারেরা চেষ্টা করে সতুর দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন। সতু চোখ মেলল। কিন্তু কোথায় সেই চোখ! চোখ যেন বোবা। পুলিশ গেল জবানবন্দী নিতে। সতু হাসতে লাগল। তারপর সত্যি কথাটা জানা গেল। ভগবান সত্যি সতুকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সতু চিনতে পারে, বলতে পারে, কিন্তু আগের মত নয়। অত বড় শরীর যেন ১০ বছরের ছেলে। সতুর বুদ্ধিতে আর শান দেওয়া হ'ল না! (আলো বড় হয়)

স: বুদ্ধিটারে দিও জোরে শান। চল্ চল্ শ্মশান। কী সুন্দর বাজনা বাজছে। নাচবি দিদি?

সু: না।

স: জল পড়ে, পাতা নড়ে।

সু: জানিস্ সতু—

স: না না আমি কিছু জানি না।

সু: এই সতু কী সব বলছিস! তোর বেলফুল গাছে কুঁড় আসছে।

স: কে আসবে? না, কেউ আসবে না।

সু: সতু তোর বাগান দেখতে যাবি?

স: বাগান! চল শীগগির চল।

সু: না, আগে খেয়ে নে, তারপর যাব।

স: বাগানে জল দিয়েছিস্? সার আনতে হবে না? নাহলে চন্দ্রমল্লিকাগুলো বড় হবে কী করে?

সু: সতু সতু তোর মনে পড়ছে? মনে পড়ছে? তুই আমাকে সেই শিমুল ছোঁড়া শেখাচ্ছিল। আমি গাছে জল দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ছে?

স: [ভেংচে কেটে] মনে পড়েছে? কোন্ জগনে জনম আমার— কাছে আসুক না ঘাড় মটকে দেবো। [বিড়বিড় করে আঙুল চাটতে থাকে] হাত নোংরা হয়ে গেল।

সু: আয়, হাত ধুয়ে আয়। [লক্ষ্মীছেলের মত হাত ধুতে যায়।] আমার কথা সব শুনবি তো সতু? দিদির কথা শুনতে হয় না? বাড়ি থেকে বেশী কোথাও যাবি না।

স: [একগাল হেসে] হ্যাঁ শুনবো। কী একটা যেন মনে আসছে।

সু: কী? কী? মনে আসছে?

স: বাগানে জল দেবো।

সু: কাল সকালে নিজে হাতে জল দিবি।

স: তুই একটা গল্প বল।

সু: কোনটা?

স: ওই যে, ওই যে, আঃ বলনা একটা।

সু: সেই ছেলেবেলার মতো? অনন্তদার গল্প শুনবি? সে সবাইকে স্বপ্ন দেখাত।

স : অনন্তদা, কোন্ অনন্তদা ? কত অনন্ত আছে। এক দুই তিন···
[দৃশ্যান্তর সকাল। সত্য গাছে জল দিয়ে ফেরে। আলো কমে, তারপর সকালের আলো)

সু : সত্য বাগানে জল দিয়েছিস ? গাছগুলো কেমন দেখলি রে ?

স : জঙ্গল, একদম জঙ্গল। আমি রোজ বাগান পরিষ্কার করি তবু জঙ্গল। জঙ্গলগুলো কে লাগিয়ে দিয়ে গেল রে ?

সু : অনেক দিন আমরা এখানে ছিলাম না।

স : ছিলাম না !

সু : মনে নেই ? তুই হাসপাতালে গিয়েছিলি—কোলকাতায় !

স : হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কী হয়েছিল রে ?

সু : তোকে ভোলারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর—

স : হ্যাঁ আমাকে মেরেছিল, খুব মেরেছিল। এই দিদি, আবার যদি মারে ওরা। তুই কিন্তু আমায় লুকিয়ে রেখে দিস। তারপর একদিন সবাইকে খুন করে দেবো।

সু : না না ওসব কথা কখনও বলবি না, সত্য, সেই বাবা যেমন বলতো, তেমনি করে আমরা একটা বাগান করবো ! আমরা হাঁস মুরগী সব পুষবো। আমি বলে কয়ে দেখি মেয়েদের স্কুলে সেলাইয়ের টিচারিটা যদি পাই। বিত্তে তো নেই !—তার সঙ্গে যদি একটা গরু রাখা যায়।

স : হাঁস মুরগী ! খুব মজা হবে। [সুব্রতার খোলা চুলে হাত রাখে] কী নরম তোর চুলগুলো ! [চুলগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে হঠাৎ শক্ত করে ধরতে থাকে।]

সু : এই সত্য, লাগছে। ছেড়ে দে, এই সত্য, সতু, কী হচ্ছে ! [সত্য আরও জোরে পাক দিতে থাকে—সুব্রতা আর পারে না। প্রাণপণে ওর গালে একটা চড় মারে। সত্য বাচ্চা ছেলেদের মত ভয় পেয়ে ছেড়ে দেয়, তারপর কাঁদতে থাকে।] আমার লাগছিল। তুই কী হয়ে গেলিরে, সত্য !

স : আর করবো না। তুই আর মারিস না। [সুব্রতা কেঁদে ফেলে। সন্টু আর ফুন্টু ঢোকে।]

সন্ : যাঃ বাবা। ব্যাপারটা কী ? ভাই বোনে মিলে নাটক হচ্ছে না কি রে ?

স : আমি আর করবো না।

সু : সন্টু ফুন্টু, ভাল আছ তো ?

ফু : কী হয়েছে সুবিদি ?

সু : না, কিছু না। অনেকদিন পর বাড়িতে এসে—ফুন্টু, তুমি সেদিন যা উপকার করেছিলে।

ফু : আমি! আমি আবার কী করলাম ?

সু : তুমি সেদিন সত্যর খবরটা—

ফু : কী সব আবোল তাবোল বকছেন ? মাথা খারাপ হয়েছে না কি ?

সন্ : থাক থাক সে সব বাজে কথা। এই যে সতুদা কেমন আছ ? অমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছ কেন ? কী হয়েছে ?

স : কী হয়েছে ?

সন্ : কী, দেখছো কী ? ভাবছ, সন্টু চোখে চোখে রেখে কথা কইছে কী করে ? দিনকাল পাল্টে গেছে। এই পুরো এরিয়াটা এখন আমাদের আণ্ডারে। শোন, এখানে যদি টিকতে চাও তো খাও দাও, আপনা কাম করো। আর কোথাও নাক গলাতে যেও না। আমি জানি অবশ্য—যে আমাকে তুমি বেখাতির করবে না। তবে ঘোড়া রোগে যেন তোমাকে আবার না পেয়ে বসে। বয়সে আমি ছোট, কিন্তু বুদ্ধি তোমার চাইতে আমার কম কিছু নেই। তাই আমার ছেলেদের বিগড়োবার বুদ্ধি তুমি কোর না। সুবিদি, আপনাকেও বলে দিচ্ছি, এখানে থাকতে গেলে এ জায়গার চাল চলন মেনেই থাকতে হবে। বেশী চোটপাট দেখাবেন না। একে শয়তান, ওকে পাজী এ সব বলে বেড়াবেন না। বড়দের একটু সম্মান করে কথা বলবেন।

সু : তোমরা হঠাৎ এসে এসব কেন বলছ ! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !

সন্ : বুঝবেন। শীগগিরই বুঝবেন। সতুদা ! ঠিক আছে ?

স : ঠিক আছে।

সন্ : বেশ, খুব ভাল ! আমি জানি তোমার বুদ্ধিটা ঠিক রাস্তা দিয়ে চলে। মাঝখানে ভোলার সঙ্গে কি যে কেলো করে বসলে—তবে ভোলা হাওয়া। আর আমায় ফলো করলে এখানে কোন শালা তোমার কিছু করতে পারবে না। তবে অন্য কোনো পথ নিয়েছ কি—(ভঙ্গী করে)। ভুল করে কোনো বেচাল করেছ কি কেচাইন হয়ে যাবে। পাছে করে বস, তাই আগে থাকতে কথাগুলো বলে গেলাম ! ঠিক আছে ?

স : ঠিক আছে।

সন্ : এস হ্যাণ্ডশেক। আমরা ফ্রেণ্ড্‌স্, কী বল !

[হাত বাড়িয়ে দেয় ; সত্য হাত ধরে।]

স : (হঠাৎ চিনতে পেরে) স-ন-টু ! সন্ টু !

[উৎসাহিত হয়ে জোরে হাত চেপে ধরে।]

সন্ : ঠিক আছে ঠিক আছে—আরে ছাড় মাইরি। সতুদা, এবার লাগছে ছাড়, ছাড় বলছি।

[সনটু যত চেঁচায় সত্য যেন ভয় পেয়ে ওর হাত আরো জোরে চেপে ধরে।]

স : আঃ চেঁচাচ্ছ কেন ? সবাই যদি এসে পড়ে !

সন্ : হাত ছাড় সতুদা। মাইরি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সতুদা—।

[ওর মুখে যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। ফুলটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। স্ট্রাগল্ চলে। সুব্রতা ব্যাপারটা বুঝতে পারে।]

সু : সতু, সতু ! ছেড়ে দে বলছি। সতু !

ফু: সতুদা, কী ইয়ার্কি হচ্ছে?

সু: হতভাগা, সন্টুর হাত ছেড়ে দে। ছাড়, মার খাবি সতু। [মারতে থাকে। সত্য সম্বিৎ পেয়ে সন্টুর হাত ছেড়ে দেয়।]

সন্: কাজটা ভাল করলে না, সতুদা। গায়ের জোর দেখাচ্ছ আমাকে? আজকাল গায়ের জোর দরকার হয় না, বুদ্ধির জোর চাই। মনে হচ্ছে কলকাতায় বুদ্ধিটা বাঁধা দিয়ে এসেছ। ভালো, বোঝা গেল। আবার দেখা হবে চলি। [ওরা চলে যায়]

সু: হতভাগা কী করলি?

স: আর করব না। সত্যি বলছি তোকে, দিদি, আর করব না। ও চেঁচাল কেন? আমার মনে হলো যদি চিৎকার শুনে ভোলারা এসে পড়ে! তুই আমায় মার, মার, মার।

সু: ভোলারা আসবে না। এবার সন্টু ফুল্টু আসবে। ওদের চোখ মুখ আমার ভাল লাগল না। ওরা যদি আবার তোকে মারে!

সন্: ওরা আবার আমাকে মারবে?

সু: তোকে নিয়ে আমি কী করবো! বুঝতে পারছি এখানে আর থাকা যাবে না ওদের চোখ মুখ আমার ভাল লাগল নারে। কিন্তু কোথায় পালাব?

স: চল দিদি আমরা পালাই।

সু: কথা দে আমার কথা শুনবি? আমি যেটা বারণ করবো সেটা কখনো করবি না। বল, করবি না?

স: কখনো করবো না।

সু: মনে থাকবে?

স: থাকবে।

সু: তাহলে চল এখনি বেরিয়ে পড়ি।

স: চল! কী কী সঙ্গে নিবি রে দিদি?

সু: এই তো বেশ কথা বলিস। তবে মাঝে মাঝে তোর কী হয়? শোন্, মনে থাকবে তো?

স: থাকবে রে দিদি, সত্যি থাকবে দেখিস। [ওরা আড়ালে যায়। মঞ্চে কিছুক্ষণ কেউ থাকে না। একটা সুর ভেসে আসে শুধু। তারপর ওরা দুজনে বেরিয়ে আসে।]

স: সব দরকারী জিনিস নিয়েছিস তো দিদি?

সু: হঁ্যা। সব দরকারী জিনিস। কিন্তু সতু, এ রকম ভাবে যাওয়া যাবে না। দুজনে জিনিসপত্র নিয়ে একসঙ্গে বেরোলেই লোকে সন্দেহ করবে। একটা কাজ করতে পারবি?

স: কী? বল।

সু: এই দিক দিয়ে—এই ভেতরের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমের ঝিল অবধি যেতে পারবি?

স: একা?

সু: হ্যাঁ একা। পারবি?

স: পারবো। তারপর?

সু: সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। এই দুপুরে কেউ সন্দেহ করবে না। তারপর আমি গিয়ে 'কু' দেব। তখন রেল লাইনের দিকে চলতে থাকবি। পারবি?

স: পারবো। তাহলে দে, আমাকে পোঁটলাটা দে। তুই সুটকেসটা নিস্।

সু: না। তুই এমনি যা। যেন বেড়াতে বেড়াতে যাচ্ছিস। জিনিস আমি নিয়ে যাব। মনে আছে তো সব?

স: আছে। ভেতরের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমের ঝিলে যাব। তারপর তুই গিয়ে 'কু' দিলেই রেল লাইন।

সু: এই তো! কে বলে তোর বুদ্ধি নেই। এগো। [সত্য ধূর্তের মত হেসে চলে যায়।] পারবে তো। তাছাড়া আর উপায়ও তো

নেই। নাঃ দুটো নেওয়া চলবে না। [দ্রুত সুটকেসটার কিছু জিনিস পোঁটলার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। তার মধ্যে একটা পিস্তল দেখা যায় তারপর চলতে থাকে। ঘুরে ঘুরে মঞ্চের সামনে আসে। আলো বদলাতে থাকে। কু·· কু। [সত্য আসে]

স: দেখেছিস, কিছু ভুলিনি? সব মনে আছে।

সু: [চারিদিক চেয়ে] কাঁচকলা মনে আছে। কথা ছিল 'কু' শুনে শুনে তুই রেল লাইনের দিকে হাঁটবি। আমার সাঙ্গ কথা বলবার কথা ছিল না। [সত্য কোনো কথা না বলে দ্রুত হাঁটতে থাকে। সুব্রতাও। ট্রেন আসবার শব্দ।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মঞ্চসজ্জায় সামান্য বদল দেখা যায়। একটা ট্রে-র ওপর অনেকগুলো গ্লাস নিয়ে সত্য মঞ্চ পেরিয়ে চলে গেল। সুব্রতা এল। কোনো একটা ঘরোয়া কাজ করতে করতে সেও চলে গেল। সমস্ত কাজের মধ্যে একটা ব্যস্ততা। একটু পরেই সুব্রতা আর ঐ বাড়ির কর্ত্রী কুন্তলা ঢুকলেন।]

কুন্তলা: সুবাসিনী, এইবার আইসক্রীম পাঠিয়ে দাও।

সু: এক্ষুণি দিচ্ছি (চলে যায়)।

ক: উঃ বাব্বাঃ। এক একটা পার্টি হয় আর প্রাণ বেরিয়ে যায়। [ছোট একটা পাখা নিয়ে নিজেকে বাতাস করেন।] তবু ভাগ্য, এই মেয়েটা এসে পড়েছিল!

অজিত: [হাতে গ্লাস] তুমি এখানে এসে বসে পড়লে! আর ওদিকে—

ক: ওদিকে যা হয় হোক্‌গে! আর পারি না।

অ: তা বললে কি চলে নাকি!

ক: এখন থেকে চলবে।

অ: কী ব্যাপার! হঠাৎ মেজাজ খারাপ।

ক: হঠাৎ আবার কী? প্রত্যেকবার তোমার ঐ গুপ্তা সাহেবের ঐ একই রসিকতা শুনতে শুনতে আর ভালো লাগে না। আচ্ছা লোকটা ইংরিজিতে ঐ অসভ্য রসিকতা করা ছাড়া আর কিছু জানে না?

অ: হোঃ হোঃ হোঃ! এই ব্যাপার? এতদিনে আমি ভেবেছিলাম এগুলো তোমার গা সওয়া হয়ে গেছে।

ক: সহ্য করে নিই বলেই গা সওয়া হয়ে যায় না?

অ: কুন্তী! এভাবে এখানে বসে থাকলে ব্যবহারটা খুব অভদ্র দেখায়।

ক: কিন্তু অজিত, এই সব করব বলে কি আমরা জীবন শুরু করেছিলাম?

অ: না, দেশের চেহারা পাল্টে দেব বলে শুরু করেছিলাম, কিন্তু তা যখন পারলাম না তখন নিজেরাই পাল্টে গিয়ে বেশ খাপ খাইয়ে নিলাম।

ক: তুমি কবিতা লিখতে, গান লিখতে—

অ: আঃ এতদিন বাদে এ সমস্ত কথা কেন? আজ কী হুইস্কিটা বেশী খেয়েছ?

ক: কোনো সত্যি অনুভূতির কথা বললেই কি তোমাদের মনে হয় হুইস্কির জন্যেই মানুষ ঐ সব কথা বলে?

অ: আসলে কথাগুলো বাজে, মিথ্যে। সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র।

ক: ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আজ আমি এক ফোঁটাও হুইস্কি খাই নি।

অ: তাই বল! তাহলে এটাই তোমার এখন বিশেষ দরকার, আরে! আমার গেলাসটাও তো ওখানে ফেলে এলাম।

ক: সব সময় এই সব কথাগুলো অ্যাভয়েড করো কেন বলতো?

অ: কারণ পোস্টমর্টেম আমার কোনো দিনই ভালো লাগে না।

ক : কিন্তু ঐ পোস্টমর্টেম্‌ই আজ বিশেষ দরকার। [অজিত চলে যায়। সত্য ঢোকে।]

স : কবে পোস্টমর্টেম হবে? পোস্টমর্টেম্‌ করে ব্যাটারা কিছু ধরতে পারে নাকি!

ক : (আশ্চর্য) তুমি পোস্টমর্টেম্‌ সম্পর্কে কী জান?

স : আমি আবার কী জানব? আমি কিছু জানি না [সুব্রত ঢোকে]

সু : গুপ্তা সাহেব তোকে কী নিয়ে যেতে বলেছিলেন?

স : ও হ্যাঁ, একটা গেলাস।

সু : তুই বোতল থেকে কিছু খেয়েছিস?

স : না না [দ্রুত চলে যায়।]

সু : ও আপনাকে বিরক্ত করছিল?

ক : না, না তোমার ভাই মাঝে মাঝে বেশ কথা বলে। দু'চারটে ইংরিজিও তো বলে। পোস্টমর্টেম্‌ কথাটা বেশ বুঝতে পারল।

সু : ও! আমার ছোটবেলায় যখন পাকিস্তানে ছিলাম তখন একটা খুন হবার পর ঐ কথাটা সবাই খুব বলাবলি করত। সেইটা ওর মাথায় ঢুকে গেছে।

ক : তোমাদের দেখে খুব আশ্চর্য লাগে!

সু : কী?

ক : আচ্ছ, তোমার ভাই-এর কি জন্ম থেকেই এইরকম পাগলামি ভাব? না—

সু : এ্যাঁ? হ্যাঁ। ছোটবেলায় ওর একবার ভীষণ টাইফয়েড হোলো···

ক : কাজ তো ভালোই করে। বাগানটার চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

সু : হ্যাঁ। বাগান করতে সবচেয়ে ভালোবাসতো। তবে ওর সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। বেশী কথা বললেই ও যেন কেমন হয়ে যায়।

ক: তুমি তো দেখি মাঝে মাঝে খুব কথা বল।

সু: হুঁ আমাকে বলতে হয়। আমি ওর ছোটবেলার কথাগুলো ওকে শোনালে ও খুব শান্ত থাকে।

ক: সাইকোলজিক্যাল কেস্। বোঝ? মনের ব্যাপার। [দুহাতে মাথা চেপে ধরে।]

সু: আপনার কি আবার মাথা ধরেছে?

ক: হ্যাঁ আমার ড্রেসিং টেবিলের ওপর সেই ছোট্ট শিশিটায় ছোট্ট ছোট্ট ট্যাবলেট আছে—যাও তো নিয়ে এস।

সু: আপনি এত রাতে আবার ওগুলো খাবেন? সকালে দুর্বল হয়ে পড়বেন যে।

ক: তবু এসব ছাইপাঁশ গেলার চাইতে অনেক ভালো।

সু: কাল সকালে যে কি মিটিং আছে বললেন?

ক: ও, হ্যাঁ, (হেসে) রাত্রে পার্টি কর, মদ খাও। আর সকাল বেলা বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে মেয়েদের কর্তব্য সম্বন্ধে বড় বড় লেকচার দাও।

সু: তাহলে? আনবো?

ক: আনো! পারব না! শেষকালে সেবারের মতো হয়তো জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করব।

সু: কী বললেন?

ক: নাঃ তুমি তখন ছিলে না। [সুব্রতা চলে যায়।] কী যে করব! [একটা গান ধরে।]

অব নভমে পতাকা নাচত হ্যায়·········[অজিতের প্রবেশ। হাতে গ্লাস।]

অ: এই নাও। চল ওদিকে।

ক: চল! কত কথাই বলতাম। থিসিস্, অ্যান্টিথিসিস, সিন্থেসিস্—মদের গ্লাসে চমৎকার সিন্থেসিস্ তৈরী হয়েছে।

অ: এমন ভাবে কথা বলছ যেন তুমি কোন এক সরলা বালিকা ছিলে। আমিই তোমাকে জোর করে এই খারাপ পথটা ধরিয়ে দিয়েছি।

ক: আমি এতটা চাইনি।

অ: চাওয়া শুরু করলে, তখন তোমার মর্জি মত জায়গায় এসে সব কিছু থেমে যাবে নাকি ?

ক: কিন্তু তোমার মর্জি মত সব কিছু বেড়ে যাবে এরই বা কী কথা ছিল ?

অ: পছন্দ যখন হচ্ছিল না, তখন চলে গেলেই পারতে।

ক: চলে তো যেতে চেয়েছিলাম একবার। তখন পায়ে ধরে সেধে রাখনি!

অ: সেটা কি এই পার্টি ইত্যাদির কারণে, না একটা পেটি জেলাসির জন্যে? তবে সেদিন বড় ভুল করেছিলাম। একবার দেখলে পারতাম কত দূর যেতে, বা যেতেই কি না অ্যাট্ অল্!

ক: কী! তুমি কী মনে কর—দোষগুলো লোকের সামনে বড্ড চেপে রেখে দিই, তাই না! তাই এখনো সকলের শ্রদ্ধেয় অজিতদা! না ?

অ: চুপ কর!

ক: চুপ করে থেকে আর সহ্য করেই তো তোমার প্রগ্রেস্ এত বেড়ে গেছে। মস্ত বড় প্রগ্রেসিভ! কোন্ জিনিসটা বাকী আছে ?

অ: ইউ স্লাট্...... যখন আদর্শের জন্যে না খাওয়ার পথ ধরেছিলাম, না খেয়েও যখন কবিতা লেখা ছাড়িনি, তখন কে বলেছিল যে ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলের এরকম ভাবে শুকিয়ে মরবার কোনো মানে হয় না। কে মাথায় ঢুকিয়েছিল যে চারিদিকের সবই যখন ভেস্তে যাচ্ছে, যে যার গুছিয়ে নিচ্ছে, তখন তোমার বোকার মত পড়ে পড়ে মার খাওয়ায় কোনো মানে হয় না? কে? কে?

ক: তার মধ্যে নিশ্চয়ই এই কথা ইম্প্লায়েড ছিল না যে তুমি তোমার বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক প্রেম করতে যাবে ?

অ : ওঃ তাইতে বড্ড গায়ে লাগে, না ? আর, কুন্তী, ব্ল্যাক মানি দিয়ে গয়না গড়াতে তো ৪৭ সালের সেরা প্রগতিপরায়ণা মেয়েটির এতটুকু বাধে না ! কী ! বল, উত্তর দাও ? তারপর ফাউ হিসেবে আমি যাই করি না কেন !

ক : শাট্ আপ্। ইউ ডিবচ্। [ও'দিকে রেকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। হৈ হৈ আওয়াজ। ফটিকের প্রবেশ।]

ফটিক : অজিতদা। ও এখানে! ডিস্টার্ব করলাম ; আমি যাই।

অ : আরে না না। এটা এমন একট কিছু ব্যাপার না। তুমি এমন ভাবে পালাচ্ছ যেন ভীষণ একটা কোমল প্রেমে বাধা দিলে ! কী ব্যাপার বল।

ক : না, একটা নতুন কবিতা লিখেছিলাম, আপনাকে না শুনিয়ে—

অ : পড় পড় ; [সুব্রতা ঢোকে। কুন্তলার হাতে শিশিটা দেয়, কুন্তলার এক হাতে মদের গ্লাস, উত্তেজনার মুহূর্তে যা সে মাঝে মাঝে খাচ্ছিল। হঠাৎ যেন তার মনে পড়ে যায়।]

ক : এই, বলনা, এটা খেয়েছি, এর সঙ্গে কি আবার এই ওষুধটা খাওয়া ঠিক হবে ?

অ : না না, কী আশ্চর্য, ওতে বারবিটোন্ আছে না ! [কুন্তলা সুব্রতার হাতে ওষুধের শিশিটা দিয়ে দেয়, সুব্রতা চলে যায়।] কী হলো ? পড়, ফটিক পড়। [ফটিক পকেট থেকে সিগারেটের ছেঁড়া প্যাকেট বার করে সেটা সোজা করতে থাকে।] উরি বাবাঃ কী দারুণ ইন্‌স্‌পিরেশন ; সিগারেটের খোলায় কবিতা।

ক : আপনাদের বাড়িতে এলে এমন একটা ইন্‌স্‌পিরেশন্ পাই সত্যি। বিশেষ করে কুন্তীদিকে যখন দেখি—

অ : কুন্তী ! ইউ আর দি ইন্‌স্‌পিরেশন ! পড় পড়।

ক : নিশ্চুপ সমুদ্র যেন / চোখের তারায় আলো কাঁপে / বর্ষার আবেগে

বন্যার বর্বর প্রতিশ্রুতি / উর্বশী কি ক্লান্ত হলো ? / উন্মনা পৃথিবী চক্রাকারে ঘুরে চলে। / বন্দী শুধু তুমি। উর্বশী! উর্বশী!

অ: তারপর ?

ফ: না, এই পর্যন্তই।

অ: এ্যাঁ, এতখানি ইন্‌স্‌পিরেশন্‌-এর অপমৃত্যু ঘটালে!

ফ: আপনার ততটা ভালো লাগল না, না ?

অ: কে বললে, আরে কুন্তী সম্পর্কে কেউ এতটুকু ভালো কথা লিখলেই আমার দারুণ ভালো লাগে।

[অভী বলে একটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে আসে হাসি যেন আর ধরে রাখতে পারছে না।]

ক: আরে, কী বলবে তো ?

অভী: গুপ্তদা আপনাদের ঐ সতুকে খুব খাইয়েছে। উঃ উঃ! আর তারপর সরসীদিকে পার্টনার করিয়ে বলডান্‌স্ শেখাচ্ছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে বলডান্‌স্ উঃ বাবা, আর পারছি না!

ক: সরসী! সরসীও মাতাল হয়ে গেছে নাকি ? উঃ তোমার ঐ গুপ্তা আজ কি করছে ?

[বাইরে সত্যর উত্তেজিত আওয়াজ। অভী চলে যায়। অজিত ফটিকও উঠে দাঁড়ায়। বাইরে সুব্রতার কণ্ঠস্বর: "ছেড়ে দিন, আপনি ছেড়ে দিন।" বলতে বলতে সতুকে নিয়ে আসে। সতুর মুখটা আঁচল দিয়ে চেপে ধরেছে। ওপাশে গুপ্তার গলা—"আই উইল্‌ কিস্ দ্যাট্ সান্ অফ এ বিচ্!"]

ক: কী হয়েছে ? কী হলো ?

সু: আমি জানি না। গিয়ে দেখি গুপ্তা সাহেব সতুকে এলোপাথাড়ি মারছে। যখনই ওকে গেলাস নিয়ে যেতে বলেছেন আমার তখনই—। সতুকে মদ খাইয়ে মজা দেখবার কী দরকার ছিল ?

ক : আমি জানি, পারভার্ট কোথাকার !

অভী : (ঢোকে) কুন্তীদি, আপনার স্মেলিং সল্টটা দিন তো। সরসীদি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

ক : সে কী ?

অ : আমি আসছি। [বেরিয়ে যায়। গুপ্তা আসে।]

গুপ্তা : কোথায়, কোথায় গেল শয়তানটা ? আমি ওকে খুন করব !

স : দিদি ! আমাকে লুকিয়ে রাখ দিদি।

ক : কী হচ্ছে কী, গুপ্ত, নিরীহ ছেলেটাকে—

গু : নিরীহ ! পাকা বদমায়েস ডু য়ু নো, সরসী অজ্ঞান হয়ে গেছে ?

সু : আপনি কেন ওকে মদ খাওয়াতে গেলেন ?

গু : কুন্তী আমি তোমার মেইড্‌-এর কাছে অপমানিত হবার জন্যে আসিনি। ছোটলোক !

সু : ও ছেলেটাকে মদ খাওয়াতে, নাচ শেখাতে গেছিলেন কেন ?

ক : জবাব দাও, গুপ্তা ?

গু : তুমি তোমার ঝিএর পক্ষ নিয়ে আমায় অপমান করছ ? কোথায় নেমে যাচ্ছ, কুন্তী ! [অজিত দ্রুত এ পাশ থেকে ওপাশে চলে যায়।] অল্‌ রাইট্‌। তোমাদের সাথে এই শেষ।

ক : ডোন্ট বি সিলি, গুপ্ত। কী হয়েছে ?

গু : স্কাউনড্রেলটা সরসীকে এমন জড়িয়ে ধরেছে—

স : মিথ্যে কথা, আমি কাউকে জড়িয়ে ধরিনি।

গু : দেখ তোমার নিরীহ ছেলেকে—পাকা শয়তান। হোয়াইট্‌ ফেস্‌ড্‌ লায়ার ! গরীব হ'লেই সরল হয় না কুন্তলা। আর তোমার এই সরলা ঝিটির সম্পর্কেও সাবধান। হারামজাদী আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

সু : এতদিন ভাবতাম, এই সমস্ত গালাগাল বুঝি আমাদের গরীব-ঘরেই চলে। আপনারাও কম যান না।

সু: [ধমকে] সুবাসিনী, তোমাদের ঝি চাকরের মত রাখি না বলে বড় বেড়ে যাচ্ছ, না ? আমার সামনে আমার অতিথিকে—

সু: মাপ করবেন। মাথাটা ঠিক—

গু: আমি বলছি, দে আর নট্‌ স্ট্রেট্‌ পীপল্‌। সত্যি ভাই বোন কিনা কে জানে !

ক: তুমি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছ।

গু: এতটা বিশ্বাস করে ভালো করছ না।

ক: তুমি তো আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করে সরসীকে ওর সাথে নাচতে পাঠিয়েছিলে।

গু: তাইতেই তো বোঝা গেল। [অজিত ঢোকে]

অ: সরসীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। ওকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া দরকার। আমি না তুমি, গুপ্ত —

ক: ও ! তুমি এতক্ষণ সরসীকে নার্স করছিলে !

অ: হাঁ। হ্যাঁ আমাদের গেস্টদের সম্পর্কে আমাদের একটা কর্তব্য আছে। আমার সরসীকে নার্স করা কর্তব্য, আর তোমাদের গুপ্তাকে ঠাণ্ডা করা কর্তব্য।

ক: চল তাহলে আমি তুমি গুপ্তা সরসী সব একসঙ্গেই যাই ! অভী ফটিক আর অন্যেরা—

অ: মিস্টার ও মিসেস রায় তো আগেই চলে গিয়েছেন। দুজন ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ভাদুড়ী—

ক: থাক। হিসেব চাইছি না, তুমি এক-এক সময় এমন করো না, চল, তাহলে আমরা সবাইকে পৌঁছে দিয়ে আসি। সুবাসিনী, এসে যেন সমস্ত ঠিক-ঠাক দেখি !

গু: তোমরা ওদের বেশী ইন্‌ডালজেন্‌স্‌ দিচ্ছ। [সবাই বেরিয়ে যায়।]

সু: হতভাগা, ওসব খেতে গিয়েছিলি কেন ? বল্‌ ! তোকে ইশারায় বারণ করলাম না আমি ?

স : আর করব নারে দিদি সত্যি বলছি আর করব না।

সু : প্রত্যেক বার তোর ঐ "আর করব না" শুনতে ভালো লাগে না, আর করব না কোন্ জায়গায় বলতে হয়, সেদিকে তো টনটনে জ্ঞান আছে। কেন নাচতে গিয়েছিলি ?

স : আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করছিলো। তুই তো আমাকে বলতে বারণ করেছিলি।

সু : তাই তুই নাচতে গিয়েছিলি ?

স : হঁ্যা—না, ঐ মেয়েটা বললো, এস না, কী হয়েছে ? আমাকে এক, এক, দুই, তিন করে সব শেখাতে লাগল। তারপর তারপর···

সু : তারপর ?

স : মনে নেই, হঁ্যা, আমাকে বললো, ভয় পাচ্ছো কেন ? আমি বললাম, কোনো শালা আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। ঐ লোকটা যে আমাকে মারছিল, "বাক আপ, বাক আপ," বলে চেঁচাল। আমি বললাম ওকে চেঁচাতে বারণ কর। গানটা তাহলে শোনা যাবে না। নাচব কী করে। মেয়েটা আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললো, সুইট, সুইট। আমি বললাম, মেয়েরা মদ খেলে আমার বিশ্রী লাগে। তা বললে, তোমার বউকে মদ খেতে দিও না, কেমন। আমি বললাম আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তারপর তারপর, কী হলো—দেখি ওই লোকটা আমাকে মারছে। ভীষণ মারছে।

সু : তোকে নিয়ে মজা করছিলো। ঠাট্টা করছিলো। বুঝতে পারিস না ? তোকে একশ বার বলেছি—খালি নিজের কাজ করবি, আর কিছু করবি না।

স : করিনি তো—আমাকে জোর করে—

সু : করিনি তো আমাকে জোর করে—কেন ? একটা মিথ্যে কথা ওদের বানিয়ে বলতে পারলি না ? আমার বেলায় তো খুব মিথ্যে

বলতে পার—জিজ্ঞেস করলাম, বোতল থেকে কি খেয়েছিলি, তখন তো না, ন , না, কিছু খাইনি বলে বেশ পাশ কাটিয়ে চলে গেলি। কেন রে? কেন? তখন বুদ্ধি আসে [কান ধরে।] কোত্থেকে রে তোর?

স: আর করবে না দিদি, সত্যি বলছি আর করবো না।

সু: [এক চড় মারে] ন্যাকার মতো সব সময় 'ঐ আর করবো না' শুনে আমার গায়ে জ্বর আসে সতু! ন্যাকা! এর আগে তিন জায়গায় তুই একটা না একটা কাণ্ড করেছিস, আর আমাদের পালাতে হয়েছে। এর আগে ব্যারাকপুরে যাদের বাড়িতে ছিলাম—সেখানে তো মরতে মরতে বেঁচেছিস। তাদের ছেলে তো তাকে গুলি করে মারতো, বার বার সেখানে বারণ করিনি যে ওদের কুকুর নিয়ে ওরকম আদিখ্যেতা করবি না। না, রেক্স আমাকে ভালবাসে। ভালবাসে তো সেটার ঘাড় মুটকে মারলি কেন?

স: বারে, রেক্সই তো আগে আমার হাত কামড়ে দিল! আমি কত করে বললাম, রেক্স কামড়াস না, লক্ষ্মী ছেলে, রেক্স কামড়াস না, তবু—

সু: মিথ্যে কথা বলছিস, শয়তান। আমি দেখিনি কিছু ভাবিস? তুই বিস্কুট দেখিয়ে ওকে ভুলিয়ে ছাতে নিয়ে যাস্‌নি। বল, বল হতভাগা—

স: হ্যাঁ নিয়েছিলাম সে তো ওর সাথে খেলব বলে। তা ও আমাকে কামড়াবে কেন?

সু: তোমার খেলার রকম আমি জানি না?

স: [হাসে] খুব নরম নরম লোম ছিল রেক্সের। আর আমি যদি বলতাম দে একটু চেটে দে, অমনি আমার হাত চেটে দিত।

সু: শোন সতু, তুই যদি একটার পর একটা এই রকম কাণ্ড করিস, তাহলে কিন্তু এবার কোথাও চাকরি পাব না, কী করে খাব বলতো?

স : না, না, না খেয়ে আমি থাকতে পারবো না। উঃ কী খিদে পেয়েছে দিদি।

সু : না, আজ তোর খাওয়া বন্ধ!

স : বারে কেন? আমি কী করলাম? রেক্সই তো আমাকে আগে কামড়ে দিচ্ছিলো।

সু : উঃ সতু, আজকে কী কাণ্ডটা করলি—এরই মধ্যে ভুলে গেলি?

স : আজকে?

সু : একটু আগে কার সঙ্গে নাচছিলি?

স : ও হ্যাঁ হ্যাঁ। দিদি আমি ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করবো। কী নরম ওর চুল। ঠিক এই পর্যন্ত কী সুন্দর।

সু : মেয়েটা মেয়েটা কী? তোর চাইতে বয়সে অনেক বড়, আর বিয়ে করবি কী? এঁদের সব মেমসাহেব বলতে হয়। তোকে আমি কত শেখাব! সতু ঠাট্টা নয়, আবার কোথায় পালাব বল দেখি? কত পালাব?

স : পালাব দিদি? আবার পালাবি? এবার কোথায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবো বল?

সু : পালাবি? খুব মজা না? কী করে চাকরি যোগাড় করতে হয়! না পালাব না। যেমন করে পারি এই মেমসাহেবের হাতে পায়ে ধরে এখানেই থাকব। এই মেমসাহেব তবু অনেকের চেয়ে ভালো। শরীরে একটু দয়ামায়া আছে। জানিস সতু, তুই অনুদা তোমরা সব যেমন পার্টি করতিস, এরাও আগে তেমনি পার্টি করত। এখন অবশ্য এই রকম পার্টি করে। কী করব বল, ঝি যখন হয়েছি, ঝি-রা যা যা করে সব শিখতে হবে। কথা ছিল অনন্ত বোসের বৌ হয়ে আমি সংসার করবো। জানিস সতু, যদি আমার বিয়ে হত, তাহলে দেখতিস ঠিক আমি ঐ বজ্জাত বুড়োকে, আরে ঐ অনন্তদার বাবাকে বশ করে ফেলতাম। আমার ওপর রাগ করতেই পারতো

না, তুই বল সতু, এতগুলো বাড়িতে কাজ করলাম, কেউ কি আমার ওপর রাগ করতে পেরেছে? শোন, তোকে একটা কাজ করতে হবে। তুই বলবি, আমি গুপ্তা সাহেবের কাছে মাপ চাইব— বল কী বলবি?

স: 'আমি গুপ্ত' সাহেবের কাছে মাপ চাইব।'

সু: রোজ যেটা আমাকে বলিস সেটা বলবি।

স: কী?

সু: ঐ যে "আর করব না।"

স: কিন্তু ঐ লোকটা আমাকে খুব খারাপ কথা বলেছে। আমার মনে পড়েছে, আমার বাপ তুলে গালাগাল দিয়েছে। আমাকে 'এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট' বলেছে। আর ঐ মেয়েটাকেও আমার নামে কী সব বলেছে! আমি ওর কাছে মাপ চাইব না।

সু: চাইবি না তো?

স: না, চাইব না।

সু: চাইবি না?

স: না, চাইব না।

সু: বেশ তুই তা'লে থাক। আমার যেদিকে চোখ যায় আমি চলে যাই।

স: নারে, আমাকে ছেড়ে তুই যাস্ না।

সু: তাহলে মাপ চাইবি বল?

স: তখন থেকে বলছি আমার খিদে পেয়েছে, তা তোর কোন গরজই নেই।

সু: দেখি কী কী বেঁচেছে!

স: অনেক বেঁচেছে রে দিদি। সব ঐ টেবিলের ওপর আছে। চল্ আমি টেবিলের ওপর বসে খাব।

সু: টেবিলে বসবি কিরে, বল চেয়ারে বসে টেবিলে খাবি। না বাবা,

তুমি এখানে বস, আমি নিয়ে আসি। একদিন চেয়ারে বসলে কবে ওদের সামনেই চেয়ারে বসে পড়বি। তোমার গুণের তো ঘাট নেই।

স: কেন, আমি কি চেয়ারে বসতে জানি না? আমাদের বাড়িতে কি চেয়ার ছিল না? না, এত ভালো ভালো চেয়ার ছিল না। কিন্তু আমি কি চেয়ারে বসে টেবিলে বই রেখে পড়াশুনা করিনি?··· ··আমাকে কি কেউ কোন দিন ভেরি গুড্ বলে নি? ঐ·· ঐ ···কে?

সু: বল কে? বল সতু!

স: সেই যে চশ্মা চোখে ছিল।

সু: হ্যাঁ তারপর অনন্ত বসু।

স: অনন্ত বসু। অনন্তকুমার বসু।

সু: অনুদা, আমাদের অনুদা, যে আর একটা চেয়ারে বসে তোকে পড়াতো—ইংরেজী, গ্রামার, অঙ্ক, এ্যালজেব্রা। মনে পড়ে সতু, মনে পড়ে? যে হঠাৎ এসে বলতো, পড়াবার মজুরী দাও সুব্রতা, এক কাপ চা, আর আমি চায়ের সঙ্গে মুড়ি দিয়ে এলে বলত—দেখ সতু, তোমার দিদি বাড়তি জিনিস দিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই আর একটা বাড়তি কাজ করিয়ে নেবার মতলব আছে—আর তুই হাসতিস। যে তোকে প্রথম···

স: [চিৎকার করে] অঁ, অঁ, অঁ—অনুদা, অনুদা গো, তুমি কোথায়?

সু: চুপ কর। মনে পড়ছে কি তোর?

স: হ্যাঁ, মনে পড়ছে, সব মনে পড়ছে। ঐ বেটা গুপ্তা, ঐ তো খুন করেছিল!

সু: আবার কী যা তা বলছিস্? ও কেন খুন করবে! সে তো লালু পাল।

স: লালু পাল না। গুপ্তা, গুপ্তা, না লালু পাল না। এরা সবাই বদমাশরে

দিদি, এরা সবাই বদমাশ। আমাকে বলে কিনা বাস্টার্ড্। আমি ওকে খুন করব। আমি ওকে ছাড়ব না।

সু: সতু, সতু।

স: আমি তো কিছু পারি না। আমাকে তুই লুকিয়ে রাখিস।

সু: তোকে নিয়ে সবাই মজা করে, ঠাট্টা করে, তুই কিছুই বুঝতে পারিস না।——প্রথম যে বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছিলাম—সুব্রতা নাম আর স্কুল ফাইনাল পাশ শুনে সে বাড়ির গিন্নী বললেন—বাবাঃ, তোমার মত বিদ্যেবতীকে আমি কি কাজ দেব বল! তারপর কত সন্দেহ।···অবিশ্যি দেখা মাত্রই মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে সে-অবস্থা তো মানুষ রাখে নি। তবু বড়লোকেরা—ভদ্রলোকেরা, নিজেদের কোনো কাজই তো নিজেরা করে নিতে পারে না, তাই সুযোগ পাই! যদি বিশ্বাস করাতে পারি যে আমি চোর নই, অলস নই, আমি অল্প মাইনে নেব। হরে দরে তোমরা আমাকে সস্তাই পাচ্ছে—তাহলে টিকে যাই। কিন্তু টিকতে পারি না ঐ সতুর জন্যে। সতু তো নয়, শত্রু, শত্রু! [গাড়ির আওয়াজ, কুন্তলা ও অজিতের প্রবেশ।]

ক: ডাইনিং রুমে সব তেমনি পড়ে আছে, তুমি কী করছিলে সুবাসিনী?

সু: সতুর মাথার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল আর—

ক: বাঃ তাই বলে—

সু: আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। [চলে যায়।]

ক: বোগাস। এদের জন্য যে বলবো এরা সে মুখও নষ্ট করে দেয়।

অ: হুঁ! কী করবে এদের নিয়ে?

ক: ভাবছি।

অ: ভাবাভাবির আর কী আছে। আন্‌ফেয়ার হবার দরকার নেই। এক মাসের মাইনে বেশী দিয়ে—

ক: বাঃ চমৎকার! মদ খেয়ে গুপ্তার হ'ল উচ্ছ্বাস—চাকরের সঙ্গে বেয়াদবী করতে গেলেন—এখন তার খেসারত দিতে হবে ওদের আর আমাকে?

অ: তোমার আবার এতে কী?

ক: নাঃ, আমার তো কিছু না। তোমার এইসব পার্টি সামলাতে হবে। তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে হবে।

অ: থাম। সব সময় তোমার ঐ এককথা ভাল লাগে না। এসব যদি সত্যি বন্ধ হয়, তখন আবার এসব কেন হচ্ছে না বলে ঘ্যানঘ্যান শুরু করবে।

ক: বেশ, পার্টির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। সামনের মাসে বাবুল ছুটি নিয়ে আসছে না?

অ: সে কচি খোকাটি নয়। মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়ছে—তার জন্যে তোমার এত্তো ভাবতে হবে না।

ক: আর রিংকু? তার সামার ভেকেশন্ আসছে না? না কি ভেকেশন্‌গুলোতেও তাকে এবার থেকে আনবে না?

অ: বাঃ বাঃ বাঃ! বাড়িতে ঝি চাকর না থাকলে বাড়ির মেয়ে বাড়িতে আসবে না?

ক: ঝক্কিটা সামলাবে কে? সে এলেই তো তার আবার একপাল বন্ধুবান্ধব আসতে থাকবে। আর তারা তো না খেয়ে যাবে না।

অ: হোটেল থেকে আনিয়ে দেওয়া যাবে।

ক: ঐ ভাবে খরচ করলে জমানো টাকা কদিন শুনি?

অ: মেয়ে ভেকেশনগুলোতেও আসবে না বলে কান্নাকাটি করছিলে। এখন যখন ব্যবস্থার কথা বলছি তখন টাকার জন্য হা হুতাশ শুরু করে দিলে।

ক: তবু এদের তাড়াতেই হবে!

অ: কটা দিন কষ্ট হবে। আবার লোক জুটে যাবে। এরা আসার আগে একমাস কী করে ছিলে?

ক: সেটা জানি বলেই তো বলছি। উঃ! উইদাউট্ হেল্‌পার আমি আর পারবো না। ছেলেটা তোমার বাগানের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে কি না বল? আর সুবাসিনী—এরকম ঝি পাওয়া কিন্তু শক্ত হবে বলে দিচ্ছি। ক্লাস ফাইভ-সিক্‌স্ পর্যন্ত পড়েছে, যে কোনো কাজের বইয়ের নাম করলে এগিয়ে দিতে পারে। রান্না-বান্না, কাপড় জামা ইস্তিরি করা থেকে কি না করছে। তার উপর যদি বলি মাথাটা টিপে দাও, পাটা টিপে দাও—কখনো বিরক্তি প্রকাশ করে না।

অ: ওদিকে দেখ কত কী সরাচ্ছে।

ক: না, আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি—ও দোষ তুমি ওকে দিতে পারবে না। এরকম লোক আর একবার পাবে না এ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি।

অ: কিন্তু কী করা যাবে। দেখলে তো গুপ্তার নেশা ছুটে যাবার পরও কী রকম ভিহিমেণ্টলি বলছিল—ওরা বাড়িতে থাকলে কিছুতেই আসবে না। সরসীও ভীষণ ভয় পেয়েছে।

ক: থাম। [কেঁদে ফেলল!] ওই বা কোন্ বুদ্ধিতে নাচতে গিয়েছিল? দুবার ডিভোর্স করেছে—কচি খুকি তো নয়। আর অভী বলল—

অ: কী বলল?

ক: কী আবার! খুনই ইয়ে করছিল আর কি?

অ: লজ্জাবতী লতা হয়ে গেলে নাকি!

ক: গুপ্তা সরসীকে বিয়ে করলেই তো পারে।

অ: হি ইজ, নট্ দ্য ম্যারিয়িং টাইপ্। কিন্তু যাকগে। ওরা যখন

এতো বেশী ইয়ে করছে—ধর ওদের বাড়ির চাকর যদি তোমাকে এরকম করে। সেই চাকর থাকলে আমরাই কি যেতে পারতাম ওদের বাড়িতে ?

ক : কিন্তু বার বার বলছি যে ওকে ও রকম করতে বাধ্য করা হয়েছে।

অ : না না কুন্তী, এখানে তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। যত যাই হোক, ওর ওরকম করে জড়িয়ে ধরার কোন জাষ্টিফিকেশন নেই।

ক : জানই তো ওর মাথায় ছিট আছে।

অ : যতই ছিট থাক। কচি খোকা তো নয়। তাছাড়া ঐ রকম একটা ইম্‌বেসিলের জন্য আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করতে পারবো না।

ক : ও: ভদ্রলোকের ফ্র্যাটারনিটি ! "লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্রাটারনিটি। দুনিয়ার মজদুর এক হও"-এর বদলে "কোলকাতার ভদ্রলোক সব এক হও।"

অ : হা:, হা:, হা: ! দারুণ বলেছ কুন্তী। আমি একটু অ্যামেণ্ড করি কুন্তী। বল—"কোলকাতার অভিজাত মাতালেরা এক হউন।"

[সুব্রতা ঢোকে।]

ক : হয়েছে ? ওদিকে গেছলে ? খেয়েছ তো ?

অ : কুন্তী, বলে দাও ওকে—

সু : আপনাদের কথা আমি একটু শুনে ফেলেছি। আমি কথা দিচ্ছি ও আর কখনো ও রকম করবে না।

অ : তুমি কথা দিলে তো হবে না।

সু : সতু গুপ্তা সাহেবের কাছে মাপ চাইবে।

ক : কী, এতেও হবে না ?

অ : দেখি, ডাকতো ওকে। [সুব্রতা মঞ্চের যেদিকে সতু ঘুমোচ্ছে সেদিকে এসে ওকে অনেক কষ্টে তুলে নিয়ে অজিতের সামনে আনে। সত্য উদ্‌ভ্রান্ত।]

অ: আমি কী বলব, তুমিই বল কুন্তী।

ক: বাঃ, বেশ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। সুবাসিনী, তুমিই ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলো।

সু: সতু, তুই আজ খুব অন্যায় করেছিস তো? গুপ্তা সায়েব এলে তুই তাঁর কাছে মাপ চাইবি।

স: কী?

সু: গুপ্তা সায়েবের কাছে তুই মাপ চাইবি। বলবি, আর কখনো এরকম করবো না।

স: হ্যাঁ।

অ: না, খালি মাপ চাইলেই হবে না। কখনো গুপ্তা সায়েব এলে তার সামনে যাবার সাহস যেন ওর না হয়।

সু: শুনলি তো?

স: হুঁ, হুঁ।

অ: কাল বিকেলে আমি গুপ্তা সায়েবকে নিয়ে আসব। তার পায়ে হাত দিয়ে মাপ চাইবে।

ক: তুমি গুপ্তাকে কাল নিয়ে এসো।

অ: ঠিক আছে। কাল বিকেলে গুপ্তাকে নিয়ে আসব। চলো। [অজিত, কুন্তী যেতে থাকে।]

সু: তাহলে কাল বিকেলে গুপ্তা সায়েব এলে তুই মাপ চেয়ে নিবি, কেমন?

স: কোথায় গুপ্তা সায়েব? কোথায় গুপ্তা সায়েব? ওকে আমি খুন করবো। [সবাই স্তম্ভিত। পর্দা।]

তৃতীয় অঙ্ক

[কোম্পানীর মালিক মদনবাবু টেলিফোনে]

মদন: হুঁ হুঁ ওতো আমি সমঝে নিলাম নারানবাবু। আপনি যে তিন-

জনের কথা বলেছেন তাদের ভি আমি আমার লিষ্টে ইন্‌ক্লুড্‌ করেছি। আরে ছিঃ ছিঃ! তারা কামে আসুক না আসুক পে-র কোনো গড়বড় হোবে না। হুঁ হুঁ সমঝলাম, সমঝলাম। এক্‌স্‌ক্লু‌ডিংলি বিটুইন্‌ আওয়ারসেল্‌ভ্‌স্‌—তারপর বলুন, আর খবর বলুন। আমার যাওয়া হলো না। আপনার ভাতিজার জামাই কেমন হলো? ভেরি গুড। হ্যাঁ একটা কথা, রামজী যেন ছাড়া না পায়। একটু খেয়াল রাখবেন। যেখানে আছে আছে। ওটা যেন গড়বড় না হয়। হাঃ হাঃ হাঃ, ভেরি গুড। হঁা আরে আসুন না একদিন। একটু আড্ড দিব। হাঃ হাঃ আপনাদের বাঙ্গালীদের এই আড্ডা আমার ভারী পছন্দ। কিন্তু আমারা শালারা ওটার দাম দিতে এখনও শিখলাম না। কাম, কাম, কাম! এত কাম করলে কি আর্ট, কালচার কিছু হোয়? বিজনেস্‌ করছি, টাকা কামাচ্ছি। আখির কী লাভ হলো! বোলেন তো? হাঃ হাঃ, ফিকর করবেন না। সব ঠিক হবে! রাম রাম। [ফোন ছেড়ে দেয়। বেল বাজায়। কাউকে উদ্দেশ্য করে বলে—'আনে বোল'। ['দীনু'র প্রবেশ। একটা খাম দীনুর হাতে তুলে দেয়। তারপর একটা কাগজে কিছু লেখে—দীনুকে পড়তে দেয়—পড়া হলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে। দীনু চলে যায়। অন্য জায়গা। কিব্‌লিস্‌ দাঁড়িয়ে আছে। দীনু আসতে ওকে ফলো করে। ও চলতে থাকে। তারপর এক জায়গায় দু'জনে দাঁড়ায়।]

দীনু: এই নে [টাকা দেয়।]

কিব্‌লিস: এ কি—মাত্র ৫০ টাকা? না, না দীনুদা। আর কিছু দাও। না হলে মাইরী মরে যাব।

দ: ভ্যাখ্‌, কিব্‌লিস, সব সময় ওরকম ঘ্যানঘ্যান করবি না। যা দিলাম সোনা মুখ করে নিয়ে যা।

কি: জান রিস্‌ক্‌ করে কাজ করব আর—

দ : কিব্‌লিস্ জানের রিস্ক, দীনু চক্রবর্তীকে দেখাবি না। অনেক রিস্ক নিয়ে এই দীনু তৈরী হয়েছে। টপ্-এ আসতে চাও তো রিস্ক নিতে হবে।

কি : দেখ দীনুদা, তোমাকে সব কণ্ডিশন বলেছি। বাবাটার এক্স্-রে করাতে হবে। তাছাড়া ছোট ভাইটার স্কুলের মাইনে—

দ : ওসব ইস্কুল টিস্কুল করে কি হবে! দলে ভিড়িয়ে নে না।

কি : কী যে ঠাট্টা কর মাইরি। ন বছর তো বয়স মোটে।

দ : আরে এই বয়সে ট্রেনিং নিলে ভালো হবে বুঝলি না। পাকা মাল হয়ে বেরুবে!

কি : তার ওপর দুটো পোষ্য এসে জুটেছে! বাবার গ্রামের লোক। দুদিন ধরে খাচ্ছে। বাবা বলে ওদের বাবার কাছে নাকি পড়াশোনা করেছিলো। বলেছে, কাজ দেখে দে চলে যাবে। বল দীনদা কি করি। আর কুড়িটা টাকা দাও—মা কালীর দিব্যি, না হলে মরে যাব দীনদা।

দ : তুই এখন কুকুরের মতো কেঁই কেঁই করিস না—এখন বোঝাই যায় না যে জান কবুল করে তুই রামজী সিংকে মারতে গিয়েছিলি।

কি : বল তাহলে, তোমার দলের আর ক'জন আছে যে অমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাইতেই তো রামজী সিং ধরা পড়ল। মদন বাবুর কত সুবিধে হল বলো? যদি মরে যেতাম সেদিন! রামজী তো চেম্বার বার করেছিলো। যদি ছুঁড়তো গুলিটা!

দ : তাহলে আপদ চুকতো। কেঁই কেঁই শুনতে হতো না।

ক : দীনদা—ওরকম করে কথা বলবে না বলছি—আর কোন শর্মাকে পেয়েছিলে রামজীর সামনে দাঁড় করাবার জন্ত। আমি তোমাকে ভালবাসি দীনদা আর তুমি—

দ : এ্যাই দেখ! এই কিব্‌লিস, তুই একটা ব্যাবসা। এই নে ধর। দশ টাকা নে। আর পারবো না। অনেক জায়গায় ভাগ দিতে হবে।

কি : না না, আমি টাকার কথা বলছি না। এখন রামজী যদি জামিনে ছাড়া পায় তখন রিসক্‌টা কার বল ? আমাকে ছাড়বে না কি ও ?

দ : আরে জামিন ফামিন পাবে না।

কি : কী করে জানলে ? ওতো নারানদার দলের লোক। আর নারানদার আবার উপর তলায় শোঁকাশুঁকি আছে।

দ : এই চক্কোত্তি সব জানে রে সব জানে। মালিক নারানদাকে বলে দিয়েছে।

কি : এঁ্যা।

দ : তবে বলছি কী ? মালিক নারানদার আরো তিনটে পোষ্যকে পুষবে। ঠিক হয়ে গেছে। মদনবাবুর কাছে পে-রোল আমি দেখে এসেছি।

কি : ইস্—আমি শালা একটা চান্‌স্ পাই না।

দ : তোর চান্‌স্‌টাই বা কম কী হচ্ছে ? মাসে পাচ্ছিস কত ? কম কী হলো ?

কি : তুমি পাওয়াটা দেখছ দীনদা। আর দ্রব্যমূল্য বিদ্ধি দেখছ না, তোমার আর কী। তুমি তো একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই তোমার বাড়িতে সুড সুড করে জিনিস চলে যায়।

দ : আরে লেগে থাকতে হবে। আমারই কি একদিনে হয়েছে নাকি ? যে কোন কাজে সাক্‌সেস্ পেতে হলে লেগে থাকতে হয়। সিন্‌সিয়ারিটি। কিন্তু ক্যাবলা একটা লোক চাই।

কি : লোক ? কী হবে ?

দ : নারানদার হাঁড়ির খবর চাই।

কি : ঐ ভুটোকে নিয়ে আসবো দীনদা একবার ?

দ : তাদেরকে বিশ্বাস করবো কী করে ?

কি : না, না বিশ্বাস করা যায়।

দ : বিশ্বাস করা যায় ?

কি: তুমি চেষ্টা করলে কী না হয়? নইলে রাখালকে পুলিশে ধরে? আনব দীনদা?

দ: দাঁড়া। প্ল্যানটা করতে দে! আচ্ছা মালগুলোকে নিয়ে আয় দেখি কেমন। [একটু সময় যায়, কিবলিসের সঙ্গে সুব্রতা ও সত্য আসে।]

দ: তোমরা কোত্থেকে আসছ?

সু: কোলকাতা। ওখানে এক বাড়িতে কাজ—

দ: কাজ গেল কেন?

সু: তাদের পুরোনো লোক এসে গেল তাই।

দ: রেফুউজী?

সু: আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ: ওটা কে?

সু: আমার ভাই, মাথায় ছিট্ আছে।

দ: কেন?

সু: টাইফয়েড হয়েছিলো।

দ: বাড়িতে আর কে আছে?

সু: কেউ না।

কি: আমার বাবা ওদের খুব ভাল বললে।

সু: আমার বাবাকে এনারা চিনতেন।

ম: নাম কি?

সু: আমার নাম সুবাসিনী, ওর নাম সত্য।

দ: লেখাপড়া?

সু: আমি ক্লাস সিক্স্ ও ক্লাস এইট্।

দ: ওটা কী কী করতে পারে?

সু: বাগানের কাজ, গাড়ি ধোওয়ার কাজ।

দ : একটা বাড়িতে তোমাদের লাগাবার চেষ্টা করব কিন্তু—। কিব.লিস্. এইটাকে নিয়ে সর তো। [কিব.লিস্ সত্যকে নিয়ে যায়।] আমার সম্পর্কে কিছু শুনেছ ? [সুব্রতা ঘাড় নাড়ে] কী শুনেছ ?

সু : আপনার অনেক প্রতিপত্তি। আপনি ইচ্ছে করলেই আমাদের চাকরী হয়ে যেতে পারে।

দ : তোমাদের জন্য আমি চেষ্টা করব। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। নারান চৌধুরীর নাম শুনেছ ?

সু : না, আমরা তো সবে এসেছি।

দ : নারান চৌধুরী এ এলাকার খুব নামকরা লোক। নেতা। তাছাড়া অনেক রকম কাজ কারবার আছে, সে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব। আমি এখন তোমাকে যে কাজটি করতে বলবো তাতে রাজি হও ভালো, না হলে এখুনি তোমাদের টিকিট কেটে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সু : না, না, আপনি বলুন।

দ : ঐ নারান চৌধুরীর বাড়িতে লোকের দরকার। বৌদি মানে নারানদার বৌ—ভাল লোক—তাকে বলে ও বাড়িতে আমি তোমাদের লাগিয়ে দেব। মাইনে কড়ি নিয়ে বেশী হামলা কোরো না। যা বলবে, দু'একবার গুঁইগাঁই করে তাতেই রাজী হয়ে যাবে। তারপর নারানদা কী করে—তার বাড়িতে কে আসে না আসে—কী ধরনের কথাবার্তা হয়—বৌদি কখন কোথায় কতটাকা রাখেন—না, না কোন অসুবিধে হবে না। এসবগুলো একটু চালাকি করে জানবে আর আমাকে জানাতে হবে।

সু : তার মানে ? আমি······

দ : তা না হলে তো বললুম—ফেরত যেতে হবে। তোমার ভয় নেই। এ কথা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। আমার সম্পর্কে তুমি বেশী জান না। তবে দীনু চক্কোত্তি কথা দিলে কথা রাখে—

সু: না, না তা নয়। আমি যদি সব পেরে না উঠি, অত বুদ্ধি যদি আমার না হয়? তখন যদি আপনি মনে করেন—

দ: আমার তো মনে হচ্ছে তুমি পারবে। আর সত্যিই তুমি পারছো না, না ইচ্ছে করে করছ না—ও আমি ঠিক ধরতে পারবো। লোক চরিয়ে খেতে হয় আমাকে। যদি সত্যিই না পারো—তোমাদের এখুনি চলে যেতে বলবো—আর যদি চালাকি করো—তাহলে···বুঝতেই পারছো।

সু: না না, আপনার সঙ্গে আমি চালাকি করবো, ছিঃ।

দ: চলো তা হলে। [দৃশ্যান্তর—টেলিফোন।]

না: সত্য, এই সত্য আমার জুতো জোড়া নিয়ে আয়, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যালো. আমি নারান চৌধুরী বলছি, আমি যা বলছি তা'ই হবে। ···ক'টিন?···হ্যাঁ···না অত ছাড়তে পারবো না···টাকার খুব দরকার—হ্যাঁ হ্যাঁ—ইলেকশানে দাঁড়াবো। দাঁড়াবোই···[সতুকে] হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী?···পরিয়ে দে, ঐ কথাই রইলো···না, এবার ছাড়তে পারবো না। আমি আসছি। [সতুকে] বললাম না জুতোটা পরিয়ে দিতে? [সত্য জুতো পরাতে থাকে—টেলিফোন বেজে ওঠে]। হ্যালো—হ্যাঁ আমি বলছি। কী? খাতাগুলো নিয়ে পুড়িয়ে ফেল—হ্যাঁ। [উঠে দাঁড়ায়] অত সোজা না। [চলে যাচ্ছে—সুব্রতা ঢোকে।]

সু: বৌদি আপনাকে একবার ভেতরে ডেকেছেন।

না: বল সময় নেই। সত্য ব্রিফ কেস্ গাড়িতে দে। [সত্য, নারান বেরিয়ে যায়। সুব্রতা দাঁড়িয়ে থাকে। চামেলী আসে।]

চামেলী: কী হলো? বলেছিলে আমার কথা? [সুব্রতা ঘাড় নাড়ে।] তা কী বললে?

সু: একটা টেলিফোন এল তাই বোধ হয়—

চ : তোমাকে কেউ ওকালতি করতে বলে নি—কী বলছেন তাই বল।

সু : সময় নেই।

চ : চিরকাল শুনছি সময় নেই, সময় নেই, তা বিয়ে করতে কেন গিয়েছিলে ? কেন ? পার্টিতে গিয়ে, মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময়তো সময় হয়, তাদের সব নিয়ে গাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় সময় হয়। আমার বেলায় শুধু সময় নেই—কেন ?

সু : আপনি বরং ভেতরে চলুন।

চ : তুমি আমাকে ভেতরে যেতে বলার কে ? একদিন সব আগুন লাগিয়ে দেব। পলিটিক্স করছেন ! আমিও পলিটিক্স্ করনেওয়ালা ঘরের মেয়ে। আমাকে চেনে না। আমার বাবা এম. পি. হয়েছিলো। এম্ এল্ এ হতে গিয়ে হেরে ভূত তার আবার। [সত্য ঢোকে, হাতে একটা ফুলের তোড়া।] দেখি দেখি কী ! আমার জন্য এনেছ ? বাঃ সত্যি তুমি কি সুন্দর বাগান করতে পার। এত সুন্দর কাজ শিখলে কোথায় ?

সু : আমার বাবার খুব বাগানের সখ ছিল।

চ : আমার বাবারও সখ ছিল আমাদের বাড়ির বাগান—সে কত বড়। তিনজন মালী খাটতো। এদের মতো এতটুকু বাগান নাকি ? সত্য, তোমাকে একদিন আমার বাপের বাড়িতে নিয়ে যাব। রানাঘাটে। বাগান কাকে বলে তুমি একবার দেখবে। যাবে ? [সত্য ঘাড় নাড়ে।] আচ্ছা, তুমি কথা বল না কেন ? সব সময় দিদিকে এত ভয় পাও কেন ? দিদির দিকে তাকিয়ে আছ কেন ?]

সু : নিশ্চয় যাবে আপনি যখন বলেছেন।

চ : সত্যকে কথা বলতে দাও। কী, সত্য ?

স : আপনি যখন বলেছেন।

চ : ওঃ তোতা পাখীরে ! সুবানী, যাও নিজের কাজ দেখ গে। [সুব্রতা

চলে যেতে গিয়ে পেছন থেকে ইশারা করে সত্যকে চলে যাবার জন্য।] সত্য, এ জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে ?

স : খুব ভালো, যাই বাগানে জল দিই গে।

চ : ধুর, দুটোর সময় কেউ জল দেয় নাকি !

স : তাহলে অন্য কাজ করি গে।

চ : বোসো, তুমি ভাল করে খেয়েছ তো ?

স : না, আমাকে ভাত কম দেয় ! আমার পেট ভরে না, আমি আরো খাব।

চ : সে কী ? তোমাকে পেট ভরে খেতে দেয় না ! সুবাসী, সুবাসী—

স : দিদিকে ডাকবেন না, দিদি নিজের ভাত থেকে তো আমাকে দিয়েছিলো। তবু আবার আমার খিদে পেয়ে গেল। আমি আরো খাবো। [সুব্রতা আসে।]

চ : শরীরটা তো কম নয়, খিদের দোষ কী ? আমার বাপের বাড়িতে এ রকম দশ বারো জন লোক খায়। কৈ, সেখানে তো শুনিনি যে কারুর পেট ভরে না। ঐ বাড়ির হাওয়াই আলাদা। সুবাসী, তুমি বেশী করে চাল নেবে। দেখবে সত্য'র যাতে খাবারে কম না পড়ে। [বাইরে থেকে দীনুর গলা।] এস, এস দীনু। কী খবর ? সেই যে এদের দিয়ে গেলে আর পাত্তাই নেই।

দ : সময় পাই না বৌদি। তা এরা কেমন কাজকর্ম করছে ?

চ : সুবাসী, তুমি সত্যকে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দাও। [ওরা ভেতরে যায়।]

দীনু : কেন, খায়নি বুঝি ?

চ : আরে না:। আমাদের বাড়িতে খাবার অভাব নাকি ? আমার বাবা সে রকম ঘর দেখে তো আর বিয়ে দেয় নি। আসলে খাই। অতবড় চেহারাটা তো ! আর বলতে কি—খাটেও কম না। ঐ দেহে যেন মোষের শক্তি।

দ: কমিশন্ দিন বৌদি, কমিশন দিন। এত কম মাইনের ছুঁছুটো লোক। তার ওপর মোষের মত খাটছে।

চ: ফাজলামি কোরো না। আর খবর বল।

দ: খবর তো আপনি দেবেন বৌদি। দাদার মন মেজাজ কেমন?

চ: তোমার দাদার কথা আর বোলো না। সে তার কাজ নিয়ে রয়েছে। এই মিটিং, এই কে ফোন করল, এই কী হলো। আমি এসে পড়লে আবার ফোনে সাটে কথা বলে। আমার বাবাও পলিটিক্স্ করতো। কিন্তু এমন ব্যবহার বাবার কাছে তোমরা পাবে না। যেমন লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি কথা কি কাজে, কি রসিকতায় সমান তাল।

দ: কিন্তু বৌদি, আজ একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি। মঞ্জুর করতেই হবে।

চ: কী?

দ: একশোটা টাকা দিতে হবে বৌদি।

চ: না ভাই এত ঘন ঘন টাকা চাইলে—

দ: বৌদি, মনে করে দেখুন দেড় মাস আগে একবার চেয়েছিলাম। সেবার অর্ধেক দিয়েছিলেন—এবার ভাইয়ের মুখটা একটু রাখবেন বৌদি।

চ: কাজিল ছেলে। কিন্তু তোমার দাদাকে কিছুতেই এ টাকার কথা বলতে পারবে না।

দ: সে কি আমি জানি না বৌদি। ও: বৌদি, আপনার ঐ সুবাসীকে দিয়ে এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দেবেন তো। বাপ্‌রে যা রোদ বাইরে। [চামেলী ভেতরে যায়। দীনু গান ধরে। একটু পরে সুবাসী জল নিয়ে আসে।] চট্‌পট বলো কি খবর?

সু: এদের ভাবগতিক কিছু বুঝতে পারি না।

দ: চটপট বল। সময় বেশী নেই।

সু: অনেক টাকা বৌদির কাছে আছে। কিন্তু কোথায় তা এখনও বুঝতে পারিনি। একটু আগে—বাবু কার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে বললেন 'পুড়িয়ে ফেল।' কিন্তু কী, আমি বুঝতে পারিনি আর আমি এলেই বাবু ইংরাজীতে ফোনে কথা বলেন।

দ: কিছুই বুঝতে পারো না ?

সু: যা বুঝতে পারি তাতে কিছুই আন্দাজ করতে পারি না।

দ: যাকৃগে পরশু রাতে সজাগ থাকবে। অনেক মাল এ বাড়িতে আসবে—অবশ্য প্ল্যান যদি না বদলায়। আমার বিশ্বাস এ বাড়িতে চোরা কুঠুরী কিছু আছে। সেই পুরো খবরটি আমাকে ভাল করে বলতে হবে।

সু: আমার ভীষণ ভয় করছে। এ আপনি কী বলছেন! এ আমি কী করে করব ?

দ: করবে, না করলে তো চলবে ন। এর জন্য তোমাকে আলাদা মজুরী দেওয়া হবে। এই যে বৌদি চট্‌পট্‌ আসুন। [সত্য আর চামেলীর প্রবেশ।] তখন থেকে এই ভোঁদাটার সঙ্গে কী কথা বলছেন !

চ: তুমিই বা সুবাসীর সঙ্গে কী বলছিলে ?

দ: জিজ্ঞেস করছিলাম, কী রকম লাগছে। ও তো আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলছে এর আগে এমন মনিব পায়নি।

চ: তা আমার বাড়িতে তো কোনো ঝামেলা নেই। আর আমার মনও তেমন নয়। ঝি-চাকরকে ঝি-চাকরের মত আমি দেখতে পারি না। এই নিয়ে আমার ওর সঙ্গে কত সময় তর্ক হয়। মুখে বলবে সোস্থালিজম, আর ঝি-চাকরের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায়—

দ: বৌদি, দাদা সম্পর্কে এটা বাজে কথা।

চ: এই নাও ভাই, [টাকা দিলেন] এর মধ্যে ১০০টা টাকা বেশী দিলাম। সত্যকে একটু নিয়ে যাও। ওর একটা প্যাণ্ট, শার্ট কিনে

দিও। ওর কাপড় আর জামার যা অবস্থা! দেখলে তো বাজে বকছিলাম না। কাজে কথায় এক।

দ: নারানদার যোগ্য সহধর্মিণী আপনি, বৌদি। নারানদা বক্তৃতা দিচ্ছেন—আর আপনি কাজে করে দিচ্ছেন—নারানদার পরিপূরক। সুবাসিনীর জন্য একটা শাড়ী হবে নাকি?

চ: তোমার কি শাড়ীর দরকার আছে?

সু: না না আমার কিছু দরকার নেই।

দ: তাহলে চলো সত্যপদ, দেখি!

সু: আপনি ওকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন, নইলে—

দ: কোন ভাবনা নেই। যদি ম্যানেজ করতে পারি তোমারও একটা শাড়ী হয়ে যাবে।

চ: দীনু, বাজে খরচ করবে না একদম!

দ: আর একটা জিনিস—একটা বেবী ফুড।

চ: বেবী ফুড? বাড়িতে বেবীই নেই তার—

দ: হয়ে যাক একটা বেবী ফুড সত্যর জন্য। কি বলেন বৌদি? বাড়িতে স্টক আছে?

চ: কি যে সব হেঁয়ালি কর বুঝি না। তোমার দাদা কোন কালে বেবী ফুডের ব্যবসা করেছিল।

দ: ঠিক বলেছেন বৌদি, আবার যে করবে না তার ঠিক কী? ওটা বাদই দি। [দীনু আর সত্য বেরিয়ে যায়]

চ: দীনুর সঙ্গে সাবধানে মিশো। অত গদ্‌গদ হওয়া ভালো না, ওর চরিত্র সুবিধের নয়।

সু: উনি আমাকে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

চ: কাজেই তো অকাজের শুরু।

সু: আপনার বাবার বাড়িতে লোকের দরকার নেই?

চ: কেন?

স্ব : না, তেমন হলে আমরা সেখানে গিয়েও কাজ করে দিতে পারি।

চ : যেই শুনেছ আমার বাবা আরো বড়লোক, অমনি লোভে সুড়সুড়ি লেগেছে না? এখানের মত আপনা হাত জগন্নাথ সেখানে হবে না। তবে তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারি।

স্ব : আমাকে একলা? কিন্তু সতু?

চ : তোমার ভাই কি কচি খোকা নাকি?

স্ব : তা নয়। কিন্তু ওর মাথায় একটু—

চ : কিছু নেই। তুমি বলে বলে এ রকম করেছ। একটু বোকা আছে। তাই বলে—দাঁড়াও, মাকে একটা ফোন করে দেখি। মা কেবলই বলে একটা ভাল লোক দেখে দে।

স্ব : না, শুনুন, ওকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না।

চ : আদিখ্যেতা! এখানেও কাজ, সেখানেও কাজ?

স্ব : আমি যাব না।

চ : যাবে না মানে? তোমাকে যেতেই হবে। মা আমার বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। কত বার বলেছে, একটা ভাল লোক দে। আমি যদি বলি তোমাকে যেতে হবে।

স্ব : দেখুন ভুল করে কথাটা বলে ফেলেছিলাম। আমি কোথাও যেতে চাই না, এখানেই থাকবো।

চ : আহা হা, কেন বলোতো! এখানে নিশ্চয় কারো না কারো সঙ্গে একটা ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছ। কী, দীনুর সঙ্গে!

স্ব : এসব কী বলছেন?

চ : ঐ সবই হয়। দীনু যখন শাড়ীর কথা তুললে তখনই বুঝেছি।
[নারান ব্যস্ত হয়ে ঢোকে।]

ন : তোমরা এখানে কী করছ—ঘর থেকে বেরোও তো।

চ : অমন কুকুরের মত তাড়াচ্ছ কেন!

ন: কেন আসো এই ঘরে! [চামেলীরা যায়।] হ্যালো। ৪৪-৩১৮৭, আমি একটু মি: ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। বলুন, আমি কল্যাণীর চৌধুরী কথা বলছি—নারান চৌধুরী। দাদা—আমি নারান কথা বলছি। সেদিন গাড়িতে সেই যে একটা কথা বলেছিলাম না, রামজি সিংএর জামিনের ব্যাপারে। ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ। এঁ্যা, হ্যাঁ, লোয়ার কোর্টে মুভ্ করবার জন্য উকিল-বাবুকে আসতে বলেছি। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, রাখছি তাহলে নমস্কার। [বসার পর উকিলবাবু ঢোকে।]

উকিল: কী ব্যাপার! একেবারে জোর তলব?

ন: রামজির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে।

উ: হ্যাঁ, মনে আছে।

ন: ওর একটা জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উ: জামিন! মানে রামজি সিংএর! আরে মশায় ওর নামে যে অনেক কেস্ ঝুলছে তাছাড়া গোড়ার দিকে আপনিই তো বলেছিলেন ও যাতে ছাড়া না পায় সেই ব্যবস্থা করতে?

ন: হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু সিচুয়েশন এখন পালটে গেছে। রামজি সিং ছাড়া আমি একেবারে অচল।

উ: বেশ, কাল কোর্টে একটা মুভ্ করে দেখছি। কিছু টাকাপয়সা দিন। বুঝতেই তো পারছেন। ওদিকে আবার অনেক খরচ পত্তর রয়েছে।

ন: খরচ পত্তরের জন্য আপনি ভাবছেন কেন? এই নিন [খাম এগিয়ে দেয়] এতে পাঁচশো টাকা আছে।

উ: আপাতত এই দিয়েই চলুক। পরে দেখা যাবে। একটা কথা। রামজি ছাড়া পেলে কিব্লিস্ ছেলেটার খুব বিপদ হবে। গত ইলেকশনে কিবলিস আপনার হয়েই খেটেছিল।

ন: আরে মশাই কিবলিসের চেয়ে রামজি অনেক বেশী কাজের লোক। আর ইলেকশন হচ্ছে মস্তবড় একটা যজ্ঞের মত, বা যুদ্ধের মত।

এতে দু একটা বলি এদিক ওদিক হয়েই থাকে। ও আমাদের কিছু করবার নেই। [উকিল যায়, টেলিফোন বাজে।] হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ পরশু অ্যাট মিডনাইট। না মোড়ের মাথায় থাকবে, নিয়ে আসার অন্য ব্যবস্থা। হ্যাঁ হ্যাঁ। [ছেড়ে দেয়] এই মাল-গুলো আটকে রেখে যদি ঠিক সময়ে ছাড়তে পারি তাহলে—আশা করা যায় ফিফ্‌টি থাউজ্যাণ্ড। সত্য। সত্য। [সুব্রতা ঘরে ঢোকে।]

সু: সত্য বাড়িতে নেই।

ন: বেরিয়েছে? কার হুকুমে?

সু: বৌদি পাঠিয়েছেন।

ন: কোথায়?

সু: দোকানে।

ন: কেন? [চামেলীর প্রবেশ।]

চ: ওর জামা কাপড়গুলো একদম ছেঁড়া ছিল—তাই পাঠিয়েছি। কী হয়েছে তাই?

ন: আমি যখন বাড়ি আসব আমার চাকর তখন আমাকে অ্যাটেণ্ড করার জন্য এইখানে থাকবে।

চ: বল না তোমার কী চাই? সুব্রতা করে দিচ্ছে।

ন: আমার কী চাই, বাড়িতে এতক্ষণ পরে এসে আমাকে বলতে হবে?

সু: একটু চা করে আনব?

ন: হ্যাঁ যাও। [সুব্রতা চলে যায়] তোমার চাইতে তোমার ঝি-এর বুদ্ধি অনেক বেশী।

চ: অমনি করে কথা বলছো কেন? ও যদি শুনে ফেলতো। আমি কি তোমার দু চোখের বিষ হয়েছি? বিয়ে করেছিলে কেন?

ন: পলিটিক্সের ঘর দেখে বিয়ে করলাম। ভাবলাম একটু সাহায্য হবে।

চ : তুমি তো আমাকে কিছুই করতে দাও না !

ম : কাকে দেব ? দিনরাত তো খালি হিন্দী সিনেমা দেখবে।

চ : এই ছ্যাখ, এ পোড়া জায়গায় হিন্দি সিনেমা ছাড়া তো আসেই না, তা কি দেখব ?

ম : উঃ ভগবান। সে সব কথা নয়। তোমার মন অন্য দিকে। এ ব্যাপারটা তুমি বোঝই না। থাক্‌গে, কথা বলে সময় নষ্ট করে তো কিছুই লাভ নেই।

চ : আমার সঙ্গে কথা বললে তোমার সময় নষ্ট হয়, না ?

ম : প্যানপ্যানামি ভাল লাগে না যাও। আমার অন্য চিন্তা আছে।

চ : অন্য চিন্তা মানে তো কী করে কার সর্বনাশ করবে তাই !

ম : চামেলি, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

চ : একদিন তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো।

ম : চেষ্টা করো। এই নাও দু হাজার আছে এখানে, হিসেব রেখ।

চ : এত টাকার হিসেব রাখা যায় নাকি ?

ম : তা হলে দাও।

চ : ইঃ, একবার যখন দিয়েছ ফেরত পাচ্ছ যেন— [হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।]

ম : ইডিয়ট। এই বুদ্ধি নিয়ে আমাকে হেলপ্‌ করতে এলেই হয়েছিল আর কি। [সুব্রতা চা নিয়ে ঢোকে।] এতদিন তোমাকে ভাল করে লক্ষ্যই করিনি। তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে মনে হয়। শুনেছিলাম ভদ্রঘরের তোমরা। তুমি কি বিধবা ?

সু : না, আমার বিয়ে হয় নি।

ম : কেন ?

সু : আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না।

ম : ওঃ ! অন্য কোন কারণ নয় ?

সু : আজ্ঞে না।

ন : তোমাকে বিশ্বাস করা যায় কি? বিশ্বাস করা যায় তোমাকে?

সু : অবিশ্বাসের কাজ তো কিছুই করিনি।

ন : দীনু বলে যে লোকটা আসে এখানে, ও এসে এখানে কী করে না করে, একটু লক্ষ্য রাখবে। কী, পারবে না?

সু : আচ্ছা, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দেবেন না, আপনাদের এখানেই যেন কাজ করতে পাই।

ন : আচ্ছা সে দেখা যাবে।

দীনু : [বাইরে] আসছি বৌদি।

ন : এস এস দীনু।

দ : আরে দাদা যে, অনেকদিন দাদার খবর নেই। খুব ব্যস্ত না দাদা?

ন : তোমার খবর কী?

দ : আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। বাজারে একটা খবর শুনলাম। সত্যি? দাদা, আপনি নাকি ইলেকশানে দাঁড়াবেন?

ন : তুমি কী বল? দাঁড়ালে কেমন হয়?

দ : ভালই হবে দাদা।

ন : এই সন্তু, জুতোটা পালিশ করে দে! তোমরা কোন দিকে থাকবে?

দ : আপনি যেমন বলবেন।

ন : তোমাদের ভারত মিলে কেমন কাজ হচ্ছে? মদনবাবু আছেন কেমন?

দ : আমি চুনোপুঁটি, মালিকের খবর কী করে রাখবো দাদা, দেখি কলকাতা থেকে গাড়ি করে এল, গাড়ি করে চলে গেল।

ন : হুঁ অনেক টাকা করলো লোকটা……যাই বেরোই তুমি যাবে নাকি?

দ : চলুন—এক মিনিট—দাদা—বৌদিকে একটা কথা বলেই আসছি।
[দৃশ্যের অন্যদিকে। সন্তু নতুন জামা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। সুব্রতা আর চামেলী দেখছে। সন্তু খুব খুশী।]

দ : এই নিন বৌদি, ঐ একশো টাকার থেকে ফেরত চল্লিশ টাকা। সুবাসী, তোমার জন্য আর শাড়ী কিনলাম না। ওটা বৌদির বাজে খরচ হয়ে যেত।

চ : অতই যদি ইয়ে নিজের পয়সা দিয়ে কিনে দিও।

দ : সুবাসী, এক গ্লাস জল। যাই বৌদি, দেরি হলে দাদা খেপে যাবে। [চলে যায়।]

চ : সে তো খেপেই আছে। বাঃ চমৎকার দেখাচ্ছে। সত্য বসো এই চেয়ারটাতেই বসো না।

স : এই চেয়ারে ?

[অন্যদিকে—]

দ : আজ কে এসেছিল ?

সু : একটা লোকের সঙ্গে অনেক কথা বললেন।

দ : পুলিশের লোক ?

সু : এমনি জামা কাপড় ছিলো তো।

দ : চোখ কান খোলা রাখবে। [নারানের গলা—কৈ, দীনু !] যাচ্ছি দাদা। [বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে—]

চ : চমৎকার দেখাচ্ছে, কে বলবে তুমি চাকর—একেবারে যেন আমাদের মত। বসো চেয়ারটাতে।

স : অনেকদিন পর চেয়ারে বসলাম। আপনি রাগ করবেন না তো ?

চ : ওমা, রাগ করবো কেন ?

স : না, অনেকে করে।

চ : আমি করি না। মুখে বলব, সোস্যালিজম্। আর ঝি-চাকরের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায় ?

সু : (ঢুকে)। একী ওঠ্! ওঠ্! [সত্য উঠতে যায়।]

চ : আঃ, কী হচ্ছে কী ? বোসো সত্য। যাও, তুমি বরং আমাদের জন্য দু পেয়ালা চা করে নিয়ে এস। [সুব্রতা চলে যায়।] এই

শার্টটাতে তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে। [হাত ধরে] বোসো, আমি যা বলবো তাই শুনবে। দিদিকে অত ভয় পাও কেন ?

স : দিদি বকবে।

চ : আমার সামনে বকুক তো, তোমাকে বলে বুদ্ধু। মাথায় ছিট আছে।

স : কোন্ শালা বলে মাথায় ছিট আছে।

চ : তোমার দিদি তো সব সময় সকলের কাছে বলে। নিশ্চয় কোন মতলব আছে। তোমাকে পাগল সাজিয়ে কোনদিন কার সঙ্গে ভেগে পড়বে।

স : মতলব বার করে দেব না।

চ : ছিঃ ছিঃ, রেগে গেলে তোমাকে বেশ দেখায়। তোমার দিদি তোমাকে মাথা খারাপ বলে কেন ?

স : জানি আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমাকে মারতে এলে আমিও এইসা দেবো।

চ : মারতে এলে তুমি সহ্য করবে কেন ?

স : একবার দিয়েছিলাম একটাকে। খুব পাজি ছিলো লোকটা—কে ? কে যেন ? ভেবেছিলো কেউ আর দেখেনি। কিন্তু আমি তো দেখে ফেলেছিলাম, তারপর কী সব হয়েছিল। আমাকে খুব ভালবাসতে লাগলো লোকটা। আমিও খুব ভালবাসলাম—কিন্তু মনে মনে। তারপর ? তার পর সেদিন ওদের বাড়ীর সবাই সিনেমা গেছে—আমি চুপি চুপি পিছন দিক দিয়ে গিয়ে, আমাকে তখনও দেখতে পায়নি—শয়তান ! ওকে যদি আবার পাই—আবার পাই—

চ : বিড়বিড় করে কী বলছো ? [চুলে হাত দেয়।]

স : দিদিকে বিধবা করেছিলো, শয়তান—[সুব্রতা ঘরে ঢোকে।]

চ : তোমার দিদি বিধবা নাকি ?

সু : আমি বিধবা হতে যাব কেন ?

চ : এই যে তোমার ভাই বলছিলো ?

সু : ও ! [হাসে] ওঃ সেই কথা। আমার বিয়ের দিন বিয়ের আগেই আমার বর কলেরাতে মারা যায়। সবাই বলতে লাগল বিয়ে না হতেই মেয়েটা বিধবা হয়ে গেল। তাই ওর মাথায় ঢুকে গেছে বিধবা।

স : মিথ্যে কথা বলবি না দিদি।

সু : তোর মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে।

স : খবরদার বলছি দিদি, ও রকম বলবি না।

চ : হিঃ হিঃ। তোমরা ভাইবোনে ঝগড়া কর আমি মাকে একটা ফোন করি। [চলে যায়]

সু : তুই কী সব যা তা বলছিল !

স : বেশ করবো বলবো, আমি কি তোর চাকর ? দূর, গল্পটা ওকে বলাই হলো না।

সু : কোনো গল্প তোকে বলতে হবে না।

স : কেমন জামাকাপড় দিয়েছে ! আমার জামা ছিঁড়ে গিয়েছিলো তোর যেন গরজই ছিল না।

সু : ফাঁদে পা দিস না। ও ভাল নয়।

স : না, ও খুব ভাল। আমাকে বলেছে, যত ইচ্ছে চেয়ে নিয়ে খেও, আমি বলে দেব। তোর খুব হিংসে হচ্ছে। হিংসুটে কোথাকার।

সু : এই, কী বলছিস !

স : বলবই তো। তুই কেন বলিস আমার মাথা খারাপ ? ও বললো আমার মাথায় কিছু হয়নি। মাথা খারাপ তো সেটাকে সাবড়ালাম কী করে ?

সু : সতু, কেউ শুনে ফেলবে।

স : ব্যাটা লালু পাল যেন দেখছিলো।

সু : লালু পালের কথা থাক্ সতু, থাক্।

স : চমকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম। বাজ পড়ল। মেঘ ডাকল। আমি বদলা নিলাম।

সু : তখনই মেঘ ডেকেছিল—বাজ পড়েছিল—তাই কেউ ধরতে পারেনি সেদিন তোকে। কিন্তু সতু—

স : আমি তো কিছুই পারি না!

সু : বাগানে যাবি না? জল কে দেবে?

স : ওঃ হ্যাঁ। গাছে তো জল দিতে হবে। [চামেলীর প্রবেশ।]

চ : পাওয়া গেল না। রানাঘাট লাইন খারাপ বললে। এ কী, চললে কোথায় সতু?

সু : গাছে জলটা দিয়ে আসুক। না হলে গাছগুলো শুকিয়ে যাবে যে।

চ : যাও, গাছে জল দিয়েই কিন্তু ছুটে আমার কাছে চলে আসবে। কেমন? সুবাসী, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? রান্নাবান্না দেখ গে। যত সব ফাঁকি দেবার চেষ্টা। [দৃশ্যান্তর]

কিব্‌লিস্ : রামজী ছাড়া পাচ্ছে কথাটা ঠিক?

দীনু : আমি জানি না।

কি : যা বলেছিলে, সব ঝুট?

দ : জানি না, যা।

কি : তোমার নারানদা কী বলে?

দ : নারানদা কিছু জানে না।

কি : আর মদনবাবু?

দ : কিছু জানে না!

কি : আমি কী করবো বলো? তোমরা তো কেউ সামনে যাওনি। আজ যদি আমাকে—

দ : টাকা দিচ্ছি—পালিয়ে যা এখান থেকে।

কি : কোথায় পালাব? বাবাটা ধুঁকছে, ভাইটা পড়ছে। মা-টা

সর্বক্ষণ খাটছে—ওদের ছেড়ে আমি কোথায় পালাব দীনুদা? ওদের কে খাওয়াবে?

দ: অত মায়া তো মস্তান হতে এসেছিলি কেন?

কি: আমি এসেছিলাম না তুমি আমাকে এনেছিলে?

দ: ই: কচি খোকারে! মায়ের কোলে শুয়েছিলি তোকে আমি ফুসলে নিয়ে এলাম!

কি: তোমার কথায় পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দ: ফের কেঁই-কেঁই। যা ইচ্ছে করগে যা।

কি: আমাকে রামজী মেরে ফেলবে!

দ: আমাদের কপালই এই। ঐ মোটা লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্ম আমাদের মরতে হবে।

কি: কেন? কেন তা হবে?

দ: এই নে একশোটা টাকা। গা ঢাকা দে কদিন। সুবিধা বুঝলে—

কি: আমার মা বাবার—

দ: চেষ্টা করবো কিছু করতে। তুই এখন যা। [অন্ধকার। একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ। আবছা আলোয় দেখা যায়—কিবলিস পালাচ্ছে, কিন্তু রামজী সিং ও তার দল ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে রিভলভার, ছোরা, কিবলিসকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। সুব্রতার প্রবেশ।]

সুব্রতা: এই যে এখন আমি সেখানে যাচ্ছি—মিষ্টি কিনতে—মিষ্টি কেনার দরকার কতটা ছিলো, জানি না, আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার দরকার ছিলো। যখন কাজে ঢুকলাম তখন বলেছিলো "বেশী বার হওয়া আমি পছন্দ করি না।" ওখানে কী হচ্ছে? খুন খুন হচ্ছে! ওরা একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বেঁধেছে। দুজন আছে—আঃ ওরা একটু একটু করে মারছে। ওকী, ওর হাত গেল—পা গেল, এবার চোখ—ও মাগো! অথচ আমার

কিছু করার নেই।—একী, এ যে কিবলিস! আমি জানি না এখানে কোথায় পুলিস, থানা! আমি কিছুই জানি না! আর জেনেও বা কি?—এই যে শুনছেন—শুনুন—ও দীনুবাবু এই গাছের আড়ালে আসুন। ঐ দিকে তাকান! দেখুন কী হচ্ছে!

দ: তুমি ওদিকে তাকাচ্ছ কেন? তাকিও না।

সু: তার মানে আপনি জানেন।

দ: আমি কিচ্ছু জানি না। তুমিও কিচ্ছু জান না। যদি বাঁচতে চাও তাহলে—তাহলে এসব জান না। রামজী সিংকে চেন না। ঐ রামজী, ওর সম্পর্কে কিছু জানতে নেই।

সু: হায় ভগবান, কেউ কিছু জানে না। কেউ কিছু জানে না। একটা ছেলেকে—কেউ কিছু জানে না। ভগবান তুমি বলতে পার না একবার যে এই পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করেছিল কে আমি জানি না। চন্দ্র সূর্যের কোনটি একবার বন্ধ করে দিতে পার না।

দ: ভগবান! শালা! এটা পৃথিবীর ঘরোয়া ব্যাপার। ভগবানের এখানে কিছু করবার নেই। বাড়ি যাও! নিজের কাজ করো। নিজের জান সম্পর্কে খেয়াল রাখ যেমন করে হোক বাঁচ। যা দেখলে সব ভুলে যাও। [দীনু চলে যায়।]

সু: ভুলে যাও। যেমন করে হোক বাঁচো। এমন বেঁচে থাকতে আমি চাই না। [দৃশ্যান্তর]

[টেলিফোনে নারানবাবু।]

নারান: [টেলিফোন] না, না, তা কেন? জামিনে যখন ছাড় আছে হাজিরা দেবে বৈকি, দেয় নি? আমি দেখছি এখুনি। কোন স্টেপ নেবেন না। কিবলিসের ডেড্‌বডি পাওয়া গেছে। রামজীই যে এটা করেছে এমন তো কোন প্রমাণ নেই? সন্দেহের বশে অবশ্য আপনারা অনেক কিছুই করতে পারেন। ও: চলে আসুন।

[সতু অন্যমনস্কের মত এসে দাঁড়ায়। হাতে মিষ্টির ঠোঙা।] এ কী? তুমি এখানে এসেছ কেন? কখন এসেছ? তুমি টেলিফোনের কথা শুনেছ?

সত্য : না।

ন : তুমি তো কিবলিসকে চিনতে না?

স : হ্যাঁ, ওর মা আমায় খেতে দিত। বলত, এই রাক্ষস কবে যাবে। হা, হা—।

ন : যাও এখান থেকে। হয় তুমি সত্যি পাগল, নয় তুমি আস্ত শয়তান, না: কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। দেখি আজকে রাতের ব্যাপারটা মিটে যাক্ তারপর। [প্রস্থান]

[অন্য দৃশ্য। সুব্রতা অবসন্ন। বসে আছে। সত্য ঢোকে। হাতে একটা প্লেটে অনেক মিষ্টি।]

স : চামেলীদি আমাকে কত মিষ্টি খেতে দিয়েছে!

সু : চামেলীদি!

স : হ্যাঁ, আমাকে বললো তুমি আমাকে বৌদি বোল না—চামেলীদি বোল। মাঝে মাঝে চামেলী বললেও আমি কিছু মনে করব না। নে দিদি, তুই দুটো খা।

সু : তুই খা সতু, আমি খাব না।

স : তুই আমার ওপর রাগ করেছিস? তবে খাবি না কেন? খা দিদি।

সু : সতু, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

স : বুঝেছি। আমাকে জামাকাপড় দিয়েছে ভাল খেতে দিচ্ছে, তোর সহ্য হচ্ছে না।

সু : তোর পায়ে পড়ি, তুই যা।

স : তা ভাল লাগবে কেন? ঐ যে দীনু, ও দিলে বুঝি খুব ভাল লাগতো?

সু : কী বললি? যত বড়ো মুখ নয় তত বড় কথা! বদমাইশ! [চড়

মারে।] করে খুন হয়ে যেতিস। আগলে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছি। বড়ো বাড় হয়েছে, না? এত লোক মরছে তুই মরিস না, তুই খুন হয়ে যা।

স: কেউ খুন করবে না—না। আমি লুকিয়ে পড়বো, আমি মরব না। [চামেলীর প্রবেশ]

চ: কে খুন করবে? কী সব কথাবার্তা? ওকে ও রকম করে ভয় দেখাচ্ছ কেন, সুবাসী!

সু: আপনি কেন আমার ভাইকে নিয়ে এ রকম করছেন!

চ: কী করেছি? দেখো আমার নামে বদনাম দেবার চেষ্টা কোর না, নষ্ট মেয়েছেলে! নিজে দীনুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছ বলে—

সু: চুপ করুন, আমার ভাইকে নষ্ট হতে দেব না। এখুনি এখান থেকে চলে যাব।

চ: সতু, চলে যাবে নাকি? আমাকে ফেলে?

স: না।

সু: সতু।

স: না। ও আমাকে কত আদর করে। চুলে হাত বুলিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল কালকে।

[নারানের প্রবেশ]

ন: কী হয়েছে? চেঁচামেচি কিসের?

চ: হুট করে বলছে, "আমরা চলে যাব।"

ন: তার মানে? মতলব কী?

চ: আমিও তো তাই বলছি। হুট করে এখনই লোক পাই কোথায়।

ন: ভেবেছিলাম সরল লোক, তা নও। সত্য, তুমি ও ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? এঁ্যা, তারপরেই চলে যেতে চাইছ। ব্যাপারটা—

চ : না, না ওর এখানেই কাজ করার ইচ্ছে। এই সুবাসীই যত নষ্টের মূল।

ন : তা যেতে চাইছো কেন ?

চ : আমি বলছি ও মেয়েছেলে মোটেই সুবিধের নয়। দীনুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি···।

ন : তাই নাকি ?

সু। একদম মিথ্যে কথা। বিশ্বাস করুন—আমার কোন বদ মতলব নেই, কেবল ভাইকে নিয়ে এখান থেকে ভালয় ভালয় চলে যেতে চাই।

ন : ব্যস্ত কেন ? যাবে। আজ তো কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। সপ্তাহ খানেক যাক। যদি দেখি সব ঠিকঠাক আছে তখন যাবে।

চ : চল সতু, তোমার অনেক কাজ পড়ে আছে। সেরে নেবে চল। [সতু, চামেলী যায়।]

ন : দীনুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী ?

সু : অ্যাঁ, কিছু না। বিশ্বাস করুন, উনি আমাকে চাকরী যোগাড় করে দিয়েছেন।

ন : চাকরী যোগাড় করে দিয়েছিল না অন্ত কথা বলে পাঠিয়েছিল ?

সু : না, অন্ত কিছু বলে পাঠায়নি।

ন : রামজী সিং সম্পর্কে কিছু জান ?

সু : কিছু জানি না। এখানে একদিন দেখেছি।

নারান : দেখা নয়। দেখা, ঐ রামজী দীনুর চেয়ে অনেক বেশী সাংঘাতিক। মনে রেখ! যাও! [প্রস্থান]

সু : বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটাব ভেবেছিলাম। এরা ভদ্রলোক! হায় ভগবান!

[দৃশ্যান্তর]

সত্য : এটা কোন জায়গা ? এখানে আমি কী করছি ? সুন্দর বাড়ি। আমার মাথাটা—আমার মাথাটা—উঃ উঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সিগারেট কিনছিলাম। ভোলা আমাকে ডাকল। তারপর—হুঁ হুঁ—তারপর নিয়ে গেল। সেই ঘরে—মারল আমাকে। প্রচণ্ড মার। বল শালা বল। লালুদাকে কে মেরেছে বল ? আমি জানি না। জানি না, তোর বাপ জানে। বদলা নেওয়া কাকে বলে জানিস না সতু ? ছেড়ে দে। আমি কিছু জানি না। আঃ আঃ দিদি, কী অন্ধকার, অন্ধকার ! মনে পড়েছে—অনুদা, দিদি। দিদির বিয়ে হবে। বাবা, অনুদা—খুন, খুন সব খুন, হয়ে যাবে।

চ : কী হলো ? দিদি মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে তো ? আমি থাকতে কে তোমার গায়ে হাত দেবে ? এসো, এসো বলছি !

স : দিদি, দিদি কই ?

চ : তোমার দিদির কত ঢং। মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়লো। আমি বলি ভালই হয়েছে। তোমার সাথে একটু নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে। পান খাবে ? এই নাও।

স : পান আমি খাই না।

চ : কেন ?

স : এমনি। দিদি বলে, যত খরচ বাড়াবি তত বাড়বে। টাকা না জমালে কোন দিন তো মুক্তি পাব না। তাই আমি সিগারেট খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি।

চ : [সত্যর গায়ে হেলান দিয়ে বসে] সুবাসীর যত উদ্ভট কথা। পয়সা জমাতে হবে বলে মানুষ সখ ছেড়ে দেবে ? খাও ! [পানটা মুখে দিয়ে দেয়]

স : না। বাঃ পানটাত বেশ ভাল।

চ : একদিন তুমি আর আমি দুজনে মিলে রানাঘাটে যাব। এই দেখ তো, আমার এইখানটায় কী ? [সত্য তাই করে।] তুমি এখান

থেকে কথনও যেও না। সুবাসীর এখন কারো সঙ্গে ভেগে পড়বার মতলব।

স: দিদি ভেগে যাবে বলছ কেন?

চ: যাবে যখন দেখবে। তোমার বোন হলে কী হয়—আমি বলছি সুবাসী নষ্ট।

স: সুবাসী বলছ কেন? সুব্রতা বলতে পার না?

চ: সুব্রতা আবার কে?

স: নষ্ট বলছ কেন? ভাল বলতে পার না?

চ: আঃ আমার চুলে লাগছে। ছাড় বলছি।

স: আঃ চেঁচিও না। সবাই এসে পড়বে। [আরো জোরে চুল টানতে থাকে]

চ: ছাড়, ছাড় বলছি! লাগছে!

স: বলছি চেঁচিও না। ওরা এসে পড়বে। [চামেলীর মুখ চেপে ধরে। চামেলী ছটফট করে। ক্রমশ অসাড় হয়ে যায়। সত্য ছেড়ে দেয়। সুব্রতা আসে। চামেলীকে দেখে।]

সু: কী করেছিস হতভাগা—কী করেছিস?

স: ও চেঁচাল কেন?

সু: [এদিক ওদিক দেখে] এখন আমি কী করি! শোন! আসার সময় তোকে যে ভাঙা শিবমন্দিরটা দেখিয়েছিলাম মনে আছে? [সত্য ঘাড় নাড়ে।] ঐখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবি? [সত্য ঘাড় নাড়ে।] তবে এই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে ওই রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যা। যতক্ষণ না আমি যাই, ওখানে বসে থাকবি। আমি যাবই। [দুজনে দুদিকে যায়। নারান ও রামজী ঢোকে।]

ন: রামজী তুমি মোড়ের দিকে লক্ষ্য রাখো। আমি চাবিটা নিয়ে আসছি।

র: ঠিক হ্যায় বাবুজী।

ন : চামেলী, চামেলী—কুঠুরির চাবিটা দাও। এ কী? সত্য, সত্য, সুবাসী! [চামেলীকে গিয়ে নাড়া দেয়, নিঃশ্বাস অনুভব করে। ডাক্তারকে ফোন করে] কী হয়েছে বুঝতে পারছি না, ডাক্তার। তুমি এক্ষুণি এসো। ঝি আর চাকরটা পালিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার বৌদি। তাড়াতাড়ি এসো, আর শোন, কাউকে বোল না। [ফোন ছাড়ার একটু পরেই আবার ফোন বাজে।] হ্যালো। অ্যাঁ! তুমি! তোমার আবার কী! স্টার্ট করেছে! দশটা পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছে? ঠিক আছে। [ফোন ছাড়ে। চামেলীর কাছে যায়।] চাবিটা—না চাবিটা ঠিকই আছে। সোনাদানাও নিয়ে যায়নি কিছু। চামেলী, চামেলী! আঃ আজকেই এই কাণ্ড করলে! কদিন থেকে দেখছিলাম ঐ ইডিয়ট ছেলেটার সঙ্গে একটু বেশী—ইডিয়ট, শয়তান কোথাকার! নারান চৌধুরীকে চেননি এখনও, আর রামজীকেও জান না। রামজী, রামজী, [রামজী ঢোকে।]—

র : জি, ক্যা হুয়া? ভাবীজি কো ক্যা হুয়া? কুছ খাস জখমি তো নেহী হুয়ী?

ন : না, না, বেঁচে আছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। ও দুটো পালিয়েছে। মদনবাবুর লোক। দীনু দিয়েছিলো।

র : পুলিশ কো খবর তো নেহী দিয়া? মাল আনেওয়ালা।

ন : ডাক্তারকে ডেকেছি। শোন প্রথমে স্টেশনটা দেখে এসো। লাস্ট ট্রেন যদি চলে যায় তবে কিছু করার নেই। ঐ দুটোকে যেমন করেই হোক ধরতে হবে। শুধু ধরলেই চলবে না। একেবারে শেষ করে দেবে। ঐ ছেলেটাকে এমন ভাবে মারবে যেন ও বুঝতে পারে যে ও মরেছে।

র : য্যায়সা কিবলিস কো?

ন : কিবলিস কে কী করেছ জানি না, যাও—মোড়ের মাথা আমি দেখছি।

মোট কথা কাল সকালে ওদের যেন চেনা না যায়। [অন্ত দৃশ্য। শিব মন্দির। সত্য প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। সুব্রতা আসে।]

সু : [হাতে রিভলভার নিয়ে] সতু, এইটে হাতে নিয়ে তুই একদিন বলেছিলি বুদ্ধিটাকে শান দিতে হবে! কিন্তু শান দেওয়া আর হল না! অনন্তদা স্বপ্ন দেখতে শেখাল—সে স্বপ্ন অনন্তদার সঙ্গে সেই পোড়ো বাড়িতে গুপ্তধন হয়ে রয়ে গেল। আর তুই আর আমি আজ এই শিব মন্দিরে গুপ্তধন হয়ে থাকব। কিন্তু তবু ঐ গুণ্ডাগুলোর হাতে তোকে আমি কিছুতেই তুলে দেব না। এই সতু! সতু!! তবু ঐ গুণ্ডাদের হাতে তোকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না।

স : (ঘুম ভেঙে) দেখেছিস দিদি, আমি কিছু ভুলি নি ঠিক জায়গায় এসেছি। বড়ো শীত করছে রে দিদি।

সু : নে এই শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে নে। [একটা শাড়ী দেয়। সত্য জড়িয়ে নেয়।] তুই কি ঘুমিয়ে পড়েছিলি ?

স : হ্যাঁরে। ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

সু : কী স্বপ্ন ?

স : আমাদের বাড়ির স্বপ্ন। একটা মস্ত বাড়ি, বিরাট বাগান। আমি সেই বাগানে কাজ করছি। যাবি ?

সু : হ্যাঁ যাব। আজই যাবো। সেখানে আর একটা নতুন বাড়ি তৈরী করবো। মস্ত বাড়ি, তাতে কতো ঘর থাকবে। আর সঙ্গে মস্ত বড় বাগান। তার মধ্যে আম-কাঁঠালের গাছ, জাম, লিচু, ফলসা, নারিকেল আরো কত গাছ। একটা মস্ত বড় পুকুর। তাতে কত মাছ খেলা করে বেড়াবে। এক পাশে থাকবে হাঁস মুরগী রাখার জায়গা।

স : হাঁস, মুরগী ? আর ?

সু : আর একপাশে থাকবে গোয়াল—কত গরু থাকবে তাতে। কত দুধ হবে। সেই দুধ আমরা বিক্রি করব।

স: দিদি, রেক্স্-এর মত একটা কুকুর রাখবি? আমি নিজে তাকে চান করিয়ে দেব, খাওয়াব। না, না, দেখিস, এবারে আর মারবো না।

সু: জানি, তুই আর কখনো কারুর গায়ে হাত দিবি না। কেবল ভালবাসবি, আদর করবি।

স: কেবল ভালবাসব আর আদর করব।

সু: কতরকমের পাখি থাকবে। সকাল সন্ধ্যে তুই তাদের ছোলা খাওয়াবি। তারা তোকে দেখলে আনন্দে চিৎকার করে বলবে—এই যে সত্যব্রত এসেছে—যে আমাদের ভালবাসে। আর অতবড় বাড়িতে আমরা দুজনেই থাকব নাকি ভেবেছিস? অনেক বাচ্চা, বাচ্চা ছেলেমেয়ে, যাদের কেউ নেই, তাদের নিয়ে আসবো। তারা সবাই সেখানে থাকবে, বাগানে কাজ করবে, আর গান করবে। আর সেই গান শোনার জন্য কতলোক আসবে। তারা বলবে, এত সুন্দর গান তোমরা কোথায় শিখলে? ছেলেমেয়েরা বলবে—ওই তো, সত্যব্রতর কাছে, যে আমাদের ভালবাসে। বাগানের ফুলগুলো বলবে এত সুন্দর করে কে আমাদের ফুটিয়েছে!—ওই সত্যব্রত। ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট চারাগাছগুলো বলবে, আমরা এত তেজী হয়েছি কেন? ওই সত্যব্রত করেছে, যে আমাদের ভালবাসে। আর তাই দেখে আকাশটা খুশী হয়ে শীতকালে দেবে শিশির আর রৌদ্র—আর গরমে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে সব, তখন দেবে মেঘ আর বৃষ্টি। আর তাইতে খুশী হয়ে গাছগুলো আরো লম্বা আরও তেজী হবে·· আরও ল-ম্বা। আরও তেজী। [পিস্তল বের করে সত্যর মাথার দিকে নিয়ে যায়। মঞ্চের উপরিভাগে রামজি সিংকে দেখা যায়। সে তার দলবলকে ইশারায় ডাকে। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। সুব্রতা সত্যকে গুলি করে। রামজি সিং'রা একটু এগিয়ে আসে। সুব্রতা রামজিদের দিকে পিস্তল উচিয়ে ধরে। পর্দা।]
